আলোর রাজপথ

(ছোটদের ইতিহাসের গল্প)

সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ রওশন আলী

আলোর রাজপথ

(ছোটদের ইতিহাসের গল্প)

মূল

আল্লামা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

অনুবাদ

অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ রওশন আলী

গোল্ড মেডেলিস্ট

এম এম, এম এ

আল হিকমাহ্ পাবলিকেশন্স
(বিজ্ঞানময় কুরআনিক ইল্‌মের বিশুদ্ধ প্রকাশনা)
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন # ০১৮১৯৪২৩৩২১, ০১৯১৫৫২৭২২৫

প্রকাশক:
অধ্যাপক আ খ ম ইউনুস

প্রকাশকাল:
আগস্ট – ২০০৪
শা'বান – ১৪২৯

প্রচ্ছদ:
আমিনুল ইসলাম আমিন
শিল্পায়ন আর্ট গ্যালারী, ঢাকা

মুদ্রণ:
মাসুম আর্ট প্রেস
৩৬, শ্রীশদাশ লেন, ঢাকা

মূল্য:
৭০.০০ (সত্তর টাকা) মাত্র
U.S. $ 2 only

ISBN- 984-70186-0003-4

পরিবেশক
ইসলামিক বুক ফাউন্ডেশন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন # ০১৯১৫৫২৭২২৫

সূচীপত্র

ভূমিকা : গল্প নয়, সত্যি

ইসলামের ইতিহাসের মহান কাহিনীগুলো জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বড়দের যেমন তেমনি ছোটদের জন্যও অনুকরণীয় ও অনুসরণীয়। ইসলামের সোনালি যুগের সেই ফেলে আসা দিনগুলো ক'জনের স্মরণের মণিকোঠায় ছায়াপাত করে! গল্প কাহিনীর বই-পুস্তকে মানুষকে ঠকাতে এবং মানুষকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে উপহাসের পাত্র বানাতে এক শ্রেণীর লেখকদের কলমের ডগায় কোন কিছুই বাধার সৃষ্টি করেনা; শুধু বাধার সৃষ্টি করে ইসলামের ইতিহাসে শিক্ষণীয় বাস্তব সত্যগুলো কাগজের পাতায় ও চলচ্চিত্রে অংকিত ও চিত্রিত করতে। এ এক প্রকার হীনমন্যতাবোধ, এক প্রকার দীনতা। তবে এ দীনতা বাংলা ভাষার নয়–এ দীনতা–এ হীনতা বাঙালী জাতির। উভয় বাঙলা, ত্রিপুরা ও আসামের প্রায় আটাশ কোটি বাঙালীর মুখের বুলি বাঙলা ভাষা; তাদের জন্য অতি লজ্জার কথা যে, এই ভাষাতেই সেই সব সোনালি সত্য, আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে রাক্ষস-খোক্কস ও ভূতপ্রেতের মত অবাস্তব কল্পিত ও মিথ্যা কাহিনী তাদের মগজে ঢালা হচ্ছে। একে বলা যায় গল্প-কাহিনীর নামে আত্মহত্যার মহড়া। নতুন প্রজন্মকে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার নামে অশেষ দুর্গতির তেপান্তরে বিসর্জন দেওয়ার অজ্ঞতা।

দুঃখ করে গালে হাত দিয়ে বসে থেকে লাভ নেই। ভুল ভেঙে শোধরানোর পথে পা বাড়ানোই বুদ্ধিমানের কাজ। বিশ্বায়নের এ আধুনিক উত্তর যুগে বসে থাকার আর সময় নেই। আমাদের নতুন

প্রজন্মের অল্প বয়সী কচিকাঁচা-সোনামনিদের চিন্তা-চেতনাকে শাণিত করা খুবই জরুরী। তাদের মেধা-মনন ও বোধের সামনে ইতিহাসের এমন বিষয়গুলো পরিবেশন করা দরকার, যা তাদেরকে নিজস্ব জাতি সত্তায়, ধর্মে, আদর্শে ও সংস্কৃতিতে উজ্জীবিত করে তোলবে। যা তাদেরকে নৈতিক বলে বলীয়ান করে আগামী ভবিষ্যৎকে গড়ার উপযোগী করে তোলবে।

এ উপমহাদেশের জগৎখ্যাত সাহিত্যিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ আল্লামা আবুল হাসান আলী আন নদভী, বলতে গেলে তিনি প্রথম ব্যক্তি, যিনি মুসলিম শিশু-কিশোর ও তরুণদের মনন ও মেধার উপযোগী ইসলামী ইতিহাসের সত্য ঘটনাগুলো অতি সহজ-সরল ও ঝরঝরে ভাষায় বইয়ের পাতায় গল্প ও কাহিনী আকারে তুলে ধরেছেন। বহু ভাষাবিদ জনাব নদভী আরবী-ইংরেজী ও উর্দূ ভাষায় একজন সব্যসাচী লেখক। অতি দক্ষতার সাথে তিনি এ ধরনের আকাঙ্ক্ষিত বহু সাহিত্য-কর্ম জাতির জন্য উপহার দিয়েছেন।

তাঁর আরবীতে মিষ্টি ভাষায় আঠারোটি গল্পের সমন্বয়ে লেখা *কাসাসুম্ মিনাত্ তারীখিল্ ইসলামী লিল্ আতফাল* নামক বইখানা ***আলোর রাজপথ*** নাম দিয়ে বাংলা ভাষায় সাজিয়েছি। যতটুকু পেরেছি ছোটদের বোধ ও মেধা-মননের উপযোগী ঝরঝরে ও সহজ ভাষায় পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ পাক আমাদের শিশু-কিশোর ও তরুণদেরকে উভয় জগতে সমুজ্জ্বল করুক সর্বান্তকরণে এই কামনাই করি।

বিনয়াবনত

সাতক্ষীরা — মুহাম্মাদ রওশন আলী

পহেলা আগস্ট, ২০০৮

আল্লাহ যখন রক্ষা করেন

মক্কায় জন্ম নিয়েছিলেন শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (স)। এটা ছিল তাঁর এবং তাঁর বাপ-দাদাদের মাতৃভূমি। মক্কার লোকেরা মূর্তিপূজা করত; জাহেলী জীবন-যাপন করত। তাদের মধ্যে ছিল পুতুল পূজা, মূর্খতা এবং যুলুম-নির্যাতন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূলকে পাঠালেন সত্য পথ প্রদর্শনের জন্য। তাঁর বয়স যখন চল্লিশ হল তখন আল্লাহ পাক তাঁর উপর ওহী নাযিল করলেন। মানুষদেরকে তওহীদের দিকে ডাকবার জন্য তিনি তাঁকে হুকুম করলেন; তিনি তাঁকে হুকুম করলেন তাদেরকে খাঁটি ধর্ম এবং ভালো কাজের দিকে ডাকতে। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাঁর সাথে শত্রুতা শুরু করল, অবশেষে এই দাওয়াতের দরুণ দেশ হয়ে উঠলো তাঁর জন্য সংকটময়। দেশবাসী তাঁর দাওয়াতকে অপছন্দ করল। কেবল তাই নয়, তারা তাঁর জীবন নাশেরও হুমকি দিল। অবস্থা দিনে দিনে করুণ ও ভয়ানক হতে লাগল।

মানুষের বন্ধু থাকে। নবীদেরও বন্ধু থাকে নবীদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হচ্ছেন আল্লাহ। নবীর এই দুর্দিনে আল্লাহ তাঁর প্রিয় বন্ধু মুহাম্মদ (স)কে মদীনায় চলে যেতে হুকুম করলেন। এটাকে হিজরত বলে। আর দেরী নয়। তিনি এবং সাথী আবু বকর (রা) গোপনে মক্কা থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে তাঁরা সওর পর্বতের গুহার নিকট পৌঁছে গেলেন। উহা ছিল মক্কা-মদীনার মাঝ বরাবর এক পাহাড়ের উপর। তাঁরা উক্ত গুহায় ঢুকে পড়লেন।

আল্লাহ তাঁর বন্ধুদের রক্ষা করতে মাকড়সা পাঠিয়ে দিলেন; মাকড়সাটি গুহার মুখের কাছে থাকা গাছ এবং গুহার মাঝখানে জাল বুনে দিয়ে আল্লাহর রাসূল (স) এবং আবু বকরকে (রা) আড়াল করে দিল; অতঃপর আল্লাহ পাঠালেন দুটো ঘুঘুকে । ঘুঘুরা পাখা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে আসলো; অবশেষে তারা মাকড়সা ও গাছটার মাঝখানে বসে পড়লো। সব কিছুই আল্লাহর সৈনিক। আল্লাহ যখন যাকে খুশি কাজে লাগান। "আসমান-যমীনের সকল বাহিনী আল্লাহর।" (সুরা আল ফাতহ, ৪)

ওদিকে মক্কার মুশরিকরাও বসে নেই। তারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিছু নিল। তারা গুহার মুখের কাছে এসে পড়ল; তাদের এবং তাদের চিনে ফেলবার মাঝখানে বাকী থাকল শুধু গুহার ভিতরের দিকে তাকানোটুকু। কিন্তু আল্লাহ তো আগেই তাদের এবং গুহার মাঝখানে আড়াল করে দিয়েছেন। তাদের সন্দেহ দেখা দিল। গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখে তারা ভাবলো, মাকড়সার জাল না ছিড়ে উহা ঠিক রেখে কেমন করে একজন লোক পাহাড়ের গুহায় ঢুকতে পারে? তাদের বুঝে আসলো না। আবু বকর (রা) হঠাৎ মুশরিকদের পায়ের নিশানা দেখতে পেয়ে বললেন–হে আল্লাহর রাসূল! তাদের কেউ যদি পা উঁচু করে তাকায় তাহলে তো আমাদেরকে দেখেই ফেলবে! আল্লাহর রাসূল (স) বললেন–আমাদের দুজনকে নিয়ে তোমার ভাববার কি আছে? আমাদের সাথে তো তৃতীয় আরেকজন আছেন।

কুরআনে আল্লাহ বলছেন–"যখন তারা গুহার মধ্যে অবস্থান করছিল তখন তাদের দ্বিতীয় জন তাঁর সাথীকে বললো– তুমি দুশ্চিন্তা করোনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" (সূরা তওবা, ৪০)

কাফেররা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

আল্লাহর রাসূল (স) মদীনায় অবস্থান কালে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। মানুষ আল্লাহর দ্বীন ও ধর্মে ঢুকতে থাকল। মক্কার কুরাইশ এবং মুশরিকদের শত্রুতা সেই অবস্থায় রয়ে গেল; তারা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিল। মুসলমানরা তাদের সামনে অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্র দিয়ে এবং সেনাবাহিনীর মুকাবিলা সেনাবাহিনী দিয়ে করতে থাকল। আল্লাহর রাসূল এক যুদ্ধ অভিযানে বের হলেন। তোমরা কি জানো সে কোন যুদ্ধ ছিল ?

তোমরা হয়তো জানো যে, মুসলমানরা আল্লাহর পথে জেহাদের জন্য বের হতো; তাঁরা শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মুশরিক ও কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতো। তোমরা মনে হয় আল্লাহর রাহে জেহাদ করার ফযীলত ও কল্যাণ সম্পর্কে জানো। নবী করীম (স) কখনো কখনো মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে যুদ্ধে বের হতেন; আবার কখনো তিনি মদীনায় থেকে যেতেন এবং মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দিতেন।

যে সব যুদ্ধে আল্লাহর রাসূল নিজে মুসলিম সেনাবাহিনীর মধ্যে অবস্থান করে আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বের হতেন, সে সব যুদ্ধকে গাযওয়া বলা হয়। আল্লাহর রাসূল (স) কোন এক গায়ওয়ায় বেরিয়ে পড়লেন এবং সেখান থেকে দুপুর বেলায় ফিরে এলেন; দিনগুলো ছিল গ্রীষ্মকালের। তাই আল্লাহর রাসূল বিশ্রাম নেওয়ার ইচ্ছা করলেন। মাঠের মধ্যে গাছ-গাছালী ছাড়া বিশ্রাম নেওয়ার মত কোন জায়গা ছিলনা। আর আরবের মাঠে-ময়দানে বাবলা গাছ ছাড়া অন্য কোন বড় গাছও ছিল না।

সুতরাং আল্লাহ পাকের রাসূল একটা বাবলা গাছের নিকট গেলেন এবং নিজের তরবারী খানা গাছে ঝুলিয়ে রাখলেন। লোকজন আলাদা আলাদা হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আল্লাহর রাসূলও বাবলা গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়লেন।
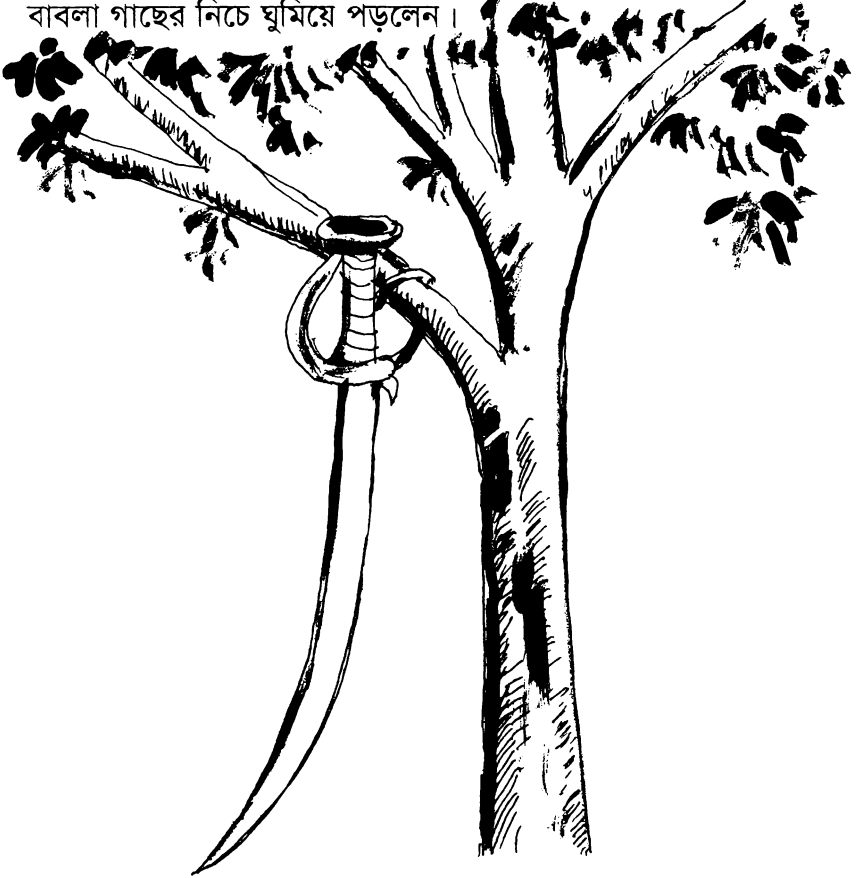
ইতোমধ্যে একজন মুশরিক এসে গেল; মুশরিক ব্যক্তিটি নিজের তরবারীখানা খাপের ভিতর থেকে বের করল। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। মুশরিক নাঙ্গা তরবারীটা হাতে নিয়ে রাসূলুল্লাহকে (স) বলল– তুমি কি আমাকে দেখে ভয় পাচ্ছ ?

রাসূলুল্লাহ (স) বললেন– “মোটেইনা।”

মুশরিকটি বলল–“তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?”

“মহান আল্লাহ”–রাসূলুল্লাহ (স) বললেন।

(এ কথা শুনতেই) মুশরিকটির হাত থেকে তরবারী খানা পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (স) তরবারী খানা উঠিয়ে নিয়ে মুশরিককে বললেন– “তাহলে এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে?”

মুশরিকটি বলল–“আপনি আমার প্রতি দয়া করুন।” আল্লাহর রাসূল বললেন–তুমি কি সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মাবুদ নেই; আর আমি আল্লাহর রাসূল? মুশরিকটি বলল– না; তবে আমি আপনার কাছে এই অঙ্গীকার করছি যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে কখনো যুদ্ধ করব না; আর যারা আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে তাদের দলেও থাকব না।’ আল্লাহর রাসূল তখন তাকে তার পথে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর মুশরিক ব্যক্তিটি তার সঙ্গীদের কাছে চলে এসে বলল–আমি তোমাদের নিকট একজন অতুলনীয় মহৎ ব্যক্তির কাছে থেকে চলে এসেছি।

অন্ধকারে মেহমানদারী

নবী মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর সাথীরা মক্কা থেকে ইয়াসরিবে হিজরত করে সেখানে বসবাস করলেন; তারা ইয়াসরিবে হিজরত করলেন কিন্তু ঘরবাড়ী, ধন-সম্পদ এবং ভাই-ভগ্নিদেরকে মক্কায় ছেড়ে চলে গেলেন। তাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল এদের নাম দিলেন 'মুহাজির' (দেশত্যাগী)।

ইয়াসরিবের মুসলমানরা তাঁদের সম্বর্ধনা জানালো, তাঁরা তাদের প্রতি খুশী হয়ে বলল– আহলান! সাহলান– শুভেচ্ছা! স্বাগতম! তাঁরা তাঁদেরকে নিজেদের বাড়ী-ঘরে জায়গা করে দিলেন; তাঁরা নিজেদের ধন-সম্পদ, মালিক-মালিকানায় তাঁদের অধিকার বর্তিয়ে দিলেন। তাই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (স) এাদের নাম দিলেন 'আনসার' (সাহায্যকারী)।

মুহাজিররা বললেন– আল্লাহ আপনাদের ধন-সম্পদ, মালিক-মালিকানা এবং বৌ-বিবিদের মধ্যে কল্যাণ দান করুক; এতে আমাদের প্রয়োজন নেই। বরং আপনারা আমাদেরকে হাট-বাজারের পথটা বাতলিয়ে দিন; আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করে রোযগার করবো। তাঁরা সেই রূপই করলেন; তাঁরা বাজারে গেলেন, কেনা-বেচা করতে লাগলেন, আল্লাহ তায়ালা অতি সত্বর তাদেরকে ধনী করে দিলেন।

ইয়াসরিব রাসূলের (স) শহরে পরিণত হল। এমন কেউ রইল না, সবাই তাকে রাসূলের মদীনা বা শুধু মদীনা বলতে লাগল।

মদীনা হয়ে গেল ইসলামের শহর, বিশ্বের বুকে একমাত্র ইসলামের শহর। এ শহর বিশ্বজাহানে মুসলমানদের হিজরত করার জায়গায় পরিণত হল; যখন কেউ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে তার জাতিরা তাকে দুঃখ-নির্যাতন করত তখন তিনি এই শহরে হিজরত করতেন, আর তাদের ছল-চাতুরি থেকে নিরাপত্তা লাভ করতেন।

মদীনা ছিল ইসলামের শিক্ষাগার–বিশ্বের বুকে ইসলামের একমাত্র শিক্ষাগার

যখন কেউ ইসলামে দীক্ষা নেয় তখন তার উপর অত্যাবশ্যক হয়ে যায় দ্বীনের শিক্ষা নেওয়া। শিক্ষা নেওয়া হালাল-হারামের শিক্ষা নেওয়া ইসলামের আইন-কানুনের। তার উপর বাধ্যতামূলক হয়ে যায় কুরআন শিক্ষা করা। দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো জানা অনিবার্য হয়ে যায় কেমন করে তাকে সালাত আদায় করতে হবে। কেমন করে রোযা পালন করতে হবে।

আর জ্ঞান অর্জন করা ছাড়া একজন মুসলমানের পক্ষে কেমন করে নামায রোযা পালন করা সম্ভব ? জ্ঞান অর্জন ছাড়া জীবনযাপন করা তার পক্ষে কেমন করে সম্ভব! কিন্তু এ জ্ঞান শিখতে সে কোথায় যাবে? মক্কায় না তায়েফে? না সেখানে তো এমন কেউ নেই যে দ্বীন ধর্মের শিক্ষা দেবে ?

মদীনাই ছিল ইসলামের শিক্ষাগার– বিশ্বের বুকে একমাত্র ইসলামের শিক্ষাগার। তাই তারা সেই দিকেই ছুটতেন।

তাই তো মুসলমানেরা আরবের সব এলাকা ছেড়ে মদীনার দিকে ফিরে যেতেন। তাদের কেউ নিজের ধর্ম নিয়ে পালিয়ে আসতেন ফেতনা-ফাসাদ থেকে বাঁচবার জন্য। আবার কেউ দ্বীনের জ্ঞান অর্জনের ইচ্ছায় মদীনায় আসতেন।

তাঁরা আল্লাহ পাকের রাসূলের কাছে চলে আসতেন। আল্লাহর রাসূল তাঁদেরকে নিয়ে আনন্দ করতেন আর বলতেন আহলান! সাহলান!– শুভেচ্ছা! স্বাগতম! তাঁরা ছিলেন আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (স) মেহমান তথা ইসলামের মেহমান। আল্লাহর রাসূল চাইতেন তাদেরকে সমাদর করে খাওয়াতে; কেননা তাঁরা তো আল্লাহপাকের– তাঁর রাসূলের, এক কথায়– ইসলামের মেহমান।

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন দুনিয়া বিমুখ। তিনি একবার খেতেন আরেকবার থাকতেন ভুখা। তিনি খেয়ে করতেন আল্লাহর শোকর আর ভুখা থেকে করতেন সবর।

রাসুলে পাকের (স) বাড়ীতে কখনো কখনো আগুন জ্বালানো হত না; খাদ্য পাকানো হত না।

আল্লাহর রাসূল (স) চাইতেন না তাঁর মেহমানরা অনাহারে থাকুক। কেননা তারা যে আল্লাহ তায়ালার– তাঁর রাসূলের, এক কথায়– ইসলামের মেহমান।

আল্লাহর রাসূল বলেন– যে ব্যক্তি আল্লাহ পাক এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন অবশ্যই তার মেহমানকে সমাদর ও সম্মান করে।

মদীনার বুকে সকল মুসলমান ছিল এক পরিবার তুল্য। মদীনা যেন একখানা বাড়ী ছিল। যখন অনেক মেহমান আসতেন তখন নবী পাক (স) তাদেরকে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। আর তাঁরা তাদেরকে সাথে করে নিজেদের বাড়ী নিয়ে যেতেন এবং আপ্যায়ন করাতেন।

এসব মেহমানরা মুসলমানদের বাড়ীতে যেতেন; সেখানে খেতেন এবং রাত্রি যাপন করতেন।

তাঁরা যেখানকারই হোক তাঁরা তো সবাই আল্লাহ এবং তার রাসূলের মেহমান ছিলেন।

আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিলেন তিনি যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে বিশেষভাবে ভালবাসতেন তেমনি রাসূল পাক (স)ও তাঁকে বিশেষভাবে ভালোবাসতেন। তিনি হলেন আনসারী সাহাবী আবু তালহা (রা)।

আবু তালহার (রা) ছিল একটা বাগান। সেই বাগানে ছিল গাছের স্নিগ্ধ ছায়া এবং মিষ্টি পানি। রাসূলুল্লাহ (স) কোন কোন দিন তার বাড়ীতে গিয়ে তার সেই বাগানে বসতেন এবং ঠাণ্ডা পানি পান করতেন।

একদিন আল্লাহর রাসূল (স) আবু বকরকে সাথে নিয়ে আবু তালহার (রা) সেই বাগানে এলেন। তিনি তাঁর বাগানে বসে পানি পান করলেন। আবু তালহা (রা) আসলেন এবং তাদেরকে পেয়ে খুব আনন্দিত হলেন। তিনি উভয়ের জন্য একটা ছাগল জবাই করতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন– দেখো আবু তালহা! খবরদার। বাচ্চা ওয়ালা দুগ্ধবতী ছাগী জবাই করবে না। অতঃপর আবু তালহা উভয়ের জন্য একটা ছাগী জবাই করলেন এবং তাদের জন্য রান্না করলেন। তাঁরা উভয়ই খাওয়া-দাওয়া করে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবী হযরত আবু তালহার (রা) জন্য দোয়া ও আশীর্বাদ করলেন।

একবার কিছু মেহমান রাসূলুল্লাহর (স) দরবারে আগমন করলেন। আল্লাহর নবী (স) তাঁদের সবাইকে মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যেকে যে যার অংশের মেহমানদেরকে নিয়ে গেলেন। হযরত আবু তালহাও (রা) তাঁর অংশের মেহমানদেরকে নিয়ে এলেন। মেহমানদেরকে পেয়ে আবু তালহা (রা) বেশ খুশী হলেন। কেননা তাঁরা তো আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূলের, এক কথায়– ইসলামের মেহমান।

আবু তালহা আনন্দিত হয়েছিলেন। কেননা এর মাধ্যমে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের পুণ্য লাভের আশা করেছিলেন।

আবু তালহা (রা) তাঁর অতিথিদেরকে নিয়ে যাত্রা করলেন; কিন্তু তিনি জানতে পারলেন না যে, বাড়ীতে মেহমানদের জন্য খানা পাবেন কিনা?

আবু তালহা জানতে পারলেন না তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রা) কী রান্না করেছেন? তিনি জানতেন না মেহমানদের খাওয়ার মত অতিরিক্ত খানা বাড়ীতে আছে কিনা?

আবু তালহা (রা) জানতেন না বাচ্চারা তাদের খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে ? না খানার জন্য অপেক্ষা করছে? তথাপি আবু তালহা এ ব্যাপারে চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন না। আর কোন কিছুই তাকে বাধা সৃষ্টি করে নাই। তিনি ছিলেন নির্বিকার।

আবু তালহা (রা) আনন্দ আর খুশীতে মেহমানদেরকে নিয়ে রাস্তা পাড়ি দিচ্ছিলেন। আবু বকরকে আবু তালহা (রা) দরজায় কড়া নাড়লেন এবং স্ত্রীকে ছালাম জানিয়ে বললেন– "আসসালামু আলাইকুম" আমি কি ভিতরে ঢুকবো?

ঘরের ভিতর থেকে আওয়াজ হল– ওয়া আলাইকুম সালাম। হা– ভিতরে ঢুকুন।

আবু তালহা (রা) ভিতরে ঢুকলেন এবং সুসংবাদদাতার সুরে বলে উঠলেন– আমার সঙ্গে আছেন রাসূলুল্লাহর (স) কতিপয় মেহমান।

উম্মে সুলাইম (রা)ও পুলকিত হলেন এবং বলে উঠলেন– মারহাবা! রাসূলুল্লাহর (স) মেহমানদের প্রতি; আবু তালহা তাঁর গৃহিনীকে বললেন– বাড়ীতে খাওয়ার কী আছে ?

উম্মে সুলাইম নির্ভয়ে উৎকণ্ঠাহীন চিত্তে বললেন– শুধু বাচ্চাদের খাবারগুলো আছে।

এখন আবু তালহা কি করবেন? খানা যা আছে তা তো পরিবার পরিজনদের জন্যই যথেষ্ট নয়; তাহলে মেহমানদের জন্য কিভাবে যথেষ্ট হবে ?

আবু তালহা চিন্তায় পড়ে গেলেন; তিনি এক মজার কৌশল অবলম্বন করলেন।

আর যারা ভদ্রলোক তাদের থাকে অনেক কলাকৌশল ও মজার মজার ব্যাপার।

আবু তালহা দৃঢ় সংকল্প করলেন একথার উপর যে, তিনি এ রাত্রে উপোষ থাকবেন, আর মেহমানদেরকে খাওয়াবেন। উম্মে সুলাইমও দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, তিনিও সে রাত্রে উপোষ থাকবেন আর মেহমানদেরকে খাওয়াবেন।

তাঁরা যদি দুজন এক রাত্রে উপোষ থাকেন আর তাঁদের মেহমানদেরকে খাওয়ান তাহলে এমন কি হবে? নিশ্চয়ই তাঁরা এক রাত্রে উপোষ থাকলে মারা যাবেন না। তাঁরা নিজেদের উপর মেহমানদের প্রাধান্য দেওয়ার দৃঢ় মত পোষণ করলেন। তারা এ কথার উপরও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলেন যে, তারা বাচ্চাদেরকে চুপ

করিয়ে রাখবেন। ফলে তারা ঘুমিয়ে পড়বে, আর (সেই অবসরে) মেহমানরা খেয়ে নেবেন।

কিন্তু ইহা কিভাবে হয় যে, মেহমানরা খাওয়া-দাওয়া করবেন অথচ মেজবান খাবেন না! আবু তালহা এ ব্যাপারে চিন্তা করলেন এবং এ দিকে একটা পথও পেয়ে গেলেন।

তিনি গৃহিনী উম্মে সুলাইমকে বললেন– "দেখো! আমরা যখন খেতে বসবো, তখন তুমি প্রদীপটার দিকে এমনভাবে এগিয়ে যাবে যেন তুমি এর সলিতাটা ঠিক করে দিতে চাচ্ছ, এই ফাঁকে তুমি প্রদীপটা নিভিয়ে দিবে।"

এভাবে মেহমানরা খেতে বসে গেলেন। আর আবু তালহাও খেতে বসলেন। উম্মে সুলাইম প্রদীপটার দিকে এমনভাবে এগিয়ে গেলেন যেন তিনি এটাকে ঠিক করে দিতে চাচ্ছেন। এক ফাঁকে তিনি প্রদীপটা নিভিয়ে দিলেন।

প্রদীপটা নিভে গেল। মেহমানরা অন্ধকারে খাওয়া শুরু করলেন। আবু তালহা থালার দিকে তার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন আর উঠিয়ে নিচ্ছেলেন। কিন্তু তিনি কিছুই খাচ্ছিলেন না। আবু তালহা (রা) তাদেরকে দেখাচ্ছিলেন যে তিনি খাচ্ছেন; অথচ তিনি কিছুই খাচ্ছিলেন না।

মেহমানরা তার খাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করলেন না। আর তারা এমন সন্দেহ করতে যাবেনই বা কেন যে কে রাতের খানা ত্যাগ করছে আর কে উপোষ থাকছে ?

মেহমানগণ নিশ্চিন্তে খাওয়া-দাওয়া করলেন এবং পরিতৃপ্ত হলেন। তারাও ধারণা করলেন যে, আবু তালহাও খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আবু তালহা আদৌ কোন লোকমা তার মুখে উঠান নাই। অন্ধকার আবু তালহার খাওয়ার ভান করতে সহায়ক হয়েছিল। মেহমানরা উঠলেন এবং তারা তাদের হাত-মুখ ধুয়ে আল্লাহ পাকের

শুকরিয়া জানালেন, এবং মেজবানের জন্য কল্যাণের দোয়া করলেন।

আবু তালহাও উঠে হাত ধুয়ে নিলেন। মেহমানরা পরিতৃপ্তির সাথে রাত্রি যাপন করলেন। আর আবু তালহা উপোষ থেকে রাত কাটিয়ে দিলেন। কিন্তু আবু তালহা খুশীতে ডগমগ হয়েছিলেন; বিগত রাতগুলোর চেয়ে এ রাত্রে তিনি আল্লাহ্ পাকের জন্য অধিক শুকরিয়া জানালেন।

নিজ অভ্যাস মত আবু তালহা রাসূলের দরবারে হাযির হলেন। আবু তালহা এতো খুশী আর এতো প্রশান্তমনা হয়েছিলেন যে মনে হচ্ছিল তিনি যেন পরিতৃপ্তির সাথে রাত্র যাপন করেছেন।

আবু তালহা ধারণা করেছিলেন যে রাত্রের এ ঘটনা গোপন রয়েছে; তিনি এবং তাঁর স্ত্রী উম্মে সুলাইম ছাড়া আর কেউ তা জানেনা।

কিন্তু আল্লাহ্ তায়ালা তো সকল লুকানো ও গোপন কথা জানেন।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে আয়াত নাযিল করে বললেন– “ইউছেরুনা ওয়ালা আন্ফুছিহিম অলাও কানা বিহিম খাসাসা”– অভাব থাকা সত্ত্বেও তারা নিজেদের উপর অপরদেরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। (সুরা হাশর, ৯)

আল্লাহর রাসূল যখন ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন তখন আবু তালহা তার কাছে রাতের এ ঘটনা জানালেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর এই আত্মত্যাগ এবং মহানুভবতায় দারুণ খুশী হলেন; তিনি আবু তালহার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হলেন।

ইতিহাসে আর তফসীরে এ কাহিনী চির অমর হয়ে রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার নিকট আবু তালহা সন্তোষের পাত্র হয়ে আছেন।

দুই অনাথ বালকের খুশি

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মক্কার বুকে মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে ডাক দিলেন এবং মানুষের মধ্যে ঘোষণা করলেন— আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নাই, মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল, তখন কুরাইশরা রাগান্বিত হয়ে পড়ল; কারণ তারা মূর্তিপূজা করতো, যে কাবা গৃহ হযরত ইব্রাহিম (আ) ও ইসমাইল (আ) এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য নির্মাণ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল ৩১৩টি দেব মূর্তি। তারা সেগুলিকে পূজা করতো।

কুরাইশরা রাগে জ্বলে উঠল। তারা আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দিতে লাগল, মুসলমানদেরকে নির্যাতন করতে থাকল। আল্লাহর নবী সবর করলেন; মুসলমানরাও সবর করে চলল; তারা তাদের মুকাবিলায় পাহাড়ের মত অনড় ও অটুট হয়ে রইলেন।

কিন্তু কুরাইশরা মানুষদেরকে ইসলাম গ্রহণে বাধা দিতেই থাকল; তারা মুসলমান আর আল্লাহর ইবাদতের মাঝখানে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল; তখন আল্লাহপাক তাঁর রাসূলকে (স) হিজরত করার নির্দেশ দিলেন। তিনি এবং মুসলমানরা মদীনায় হিজরত করলেন; মদীনা ছিল ইসলামের জন্য পবিত্র ও নিরাপদ ভূমি। মদীনাবাসীদের মধ্যে ছিল হৃদয়ের কোমলতা এবং দয়ার ভাব। হিজরতের আগেই তাদের বহুলোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

নবীজী (স) মক্কা থেকে মদীনায় এসে বসবাস করলেন এবং সেখানে তিনি মসজিদ বানাতে চাইলেন। মুসলমানদের জন্য

মসজিদ একান্ত দরকারী। কেননা মসজিদ এমন এক মেরুকেন্দ্র যার চারিপাশে ইসলামী জীবনের চাকা ঘুরে থাকে।

একদিন আল্লাহর নবী (স) আবু আইয়ুব আনসারীর(রা) বাড়ীতে গমন করলেন; তিনি তার মেহমান হলেন। তার বাড়ীর সন্নিকটে ছিল একটা পশুর আস্তাবল। আল্লাহর রাসূল চাইলেন সেই জায়গায় মসজিদ বানাবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–এই আস্তাবলটা কার?

মু'আয ইবনে আফরা নামে এক আনসার বললেন–হে আল্লাহর রাসূল! জায়গাটি দুই ইয়াতিম বালকের। তাদের একজনের নাম সহল আর অপরজনের নাম সুহায়িল।
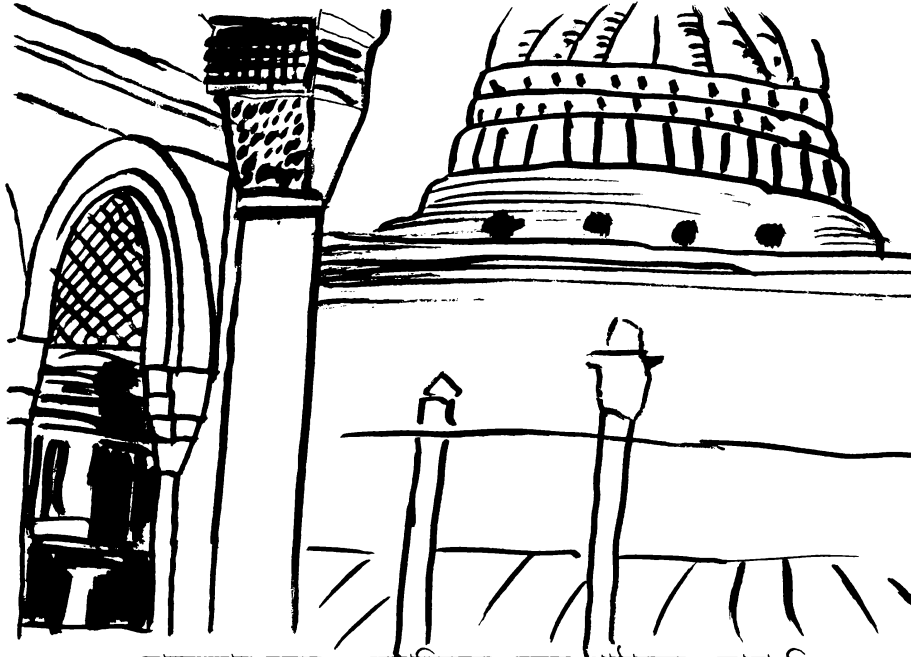
রাসূলুল্লাহ সহল ও সুহায়িলকে ডেকে পাঠালেন। তারা ছিল দুইজনই ইয়াতিম; তারা হাজির হল; রাসূলুল্লাহ তাদের সাথে এই আস্তাবল এবং এর দাম সম্পর্কে কথা বললেন; সহল ও সুহায়িল

উভয়ই বলল, হে আল্লাহর রাসূল (স) এটি আল্লাহর জন্য থাকলো; আমরা টাকার বিনিময়ে এটি বিক্রি করব না। সুতরাং আপনি এখানে মসজিদ গড়ে তোলেন; আমাদের মন এতেই খুশী হয়ে গেছে। কিন্তু আল্লাহর রাসূল তা অস্বীকার করলেন; তিনি জায়গাটা তাদের কাছ থেকে কিনে নিলেন; এবং মূল্য দিয়ে দিলেন।

মুসলমানেরা মসজিদ নির্মাণ করল; আল্লাহর রাসূলও নিজের হাত দিয়ে কাজ করতে এবং ইট বয়ে আনতে লাগলেন, তাই মুসলমানদের মধ্যে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন-"আমরা যদি বসে থাকি আর নবী (স) খাটতে থাকেন তাহলে এটা আমাদের পক্ষে এক গর্হিত কাজ হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং তারাও কাজ শুরু করলেন। তার মসজিদ তৈরী করতেন এই ছড়াটি গেয়ে গেয়ে-

"আল্লাহুম্মালা আইশা ইল্লা আইশুল্ আখিরা,
ফার্হামিল্ আন্সারা অল্ মুহাজিরা।"
আখরোতের জীবন ছাড়া কিসের জীবন ফের,
রহম কর আল্লাহ যারা আনসার মুহাজের।

আমীরুল মুমেনীন হযরত ওসমান বিন আফফান (রা) এবং তাঁর পরবর্তী রাজা-বাদশাহরা মসজিদের আয়তন বাড়িয়ে দেন; অবশেষে তা এমন বিশাল ও মনোরম এক মসজিদে পরিণত হয়েছে যাতে হাজার হাজার মুসল্লির জায়গা সংকুলান হচ্ছে।

আল্লাহপাক তোমাদের সকলকে উহা যিয়ারত করা এবং সেখান সালাত আদায় করার সামর্থ্য দান করুক।

ফাঁসির মঞ্চে নবীর মহব্বত

মহানবীর (স) সঙ্গী-সাথীরা আপন প্রভুর ইবাদত করতেন; তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষি কার্যে লিপ্ত থাকতেন। এছাড়া তাঁত বুনা, কাপড় সেলাই, লৌহকর্ম, ছুতারী ও চর্মপাকা করা প্রভৃতি নানা শিল্পকর্মে লিপ্ত ছিলেন। পেশায় তাঁরা ব্যবসায়ী, কৃষক ও শিল্পী প্রভৃতি সম্প্রদায় হলেও সবার আগে তাঁরা যেমন মুসলমান ছিলেন তেমনি সবার শেষেও ছিলেন মুসলমান।

তাঁরা মধ্যম শ্রেণীর লোকের মত পানাহার করতেন, কথা বলতেন, হাসতেন, কেনা-বেচা করতেন, চাষাবাদ করতেন এবং শিল্পকর্ম করতেন, কিন্তু এসব কিছু তারা আল্লাহর রাহে করতেন, কেননা তাঁরা এর সাহায্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইতেন।

তাঁরা আপন প্রভুর বন্দেগী করতেন; কেননা তাদেরকে তাঁরই বন্দেগী করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ বলেছেন- **"অমা খালাক্‌তুল জিন্না অল ইন্‌সা ইল্লা লিইয়াবুদুন"**-অর্থাৎ, আমি মানব ও জ্বীন জাতিকে শুধু আমার বন্দেগী করবে বলে সৃষ্টি করেছি। (সুরা জারিয়াত, ৫৬)

তাঁরা জ্ঞান অন্বেষণ করতেন, কেননা তাঁরা শুনেছিলেন, "অমা ইয়াকিলুহা ইল্লাল্‌ আলিমুন্‌"-জ্ঞানীরা ছাড়া আর কেহই এসব বোঝার ক্ষমতা রাখেনা। (সুরা আনকাবুত, ৪২)। তারা আরো শুনেছিলেন-"ইন্নামা ইয়াখ্‌শাল্লাহা মিন ইবাদিহিল্‌ ওলামাউ"- আল্লাহকে তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই ভয় করে থাকেন। (সুরা ফাতির, ২৮)। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষিকার্য ও

শিল্পকার্যে লিপ্ত থাকতেন; কেননা তারা শুনেছিলেন যে–“ফাইযা কুযিয়াতিস্ সালাতু ফান্তাশিরু ফিল আরদি অবতাগু মিন ফাদলিল্লাহ”–যখন নামায পড়া শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর নেয়ামত অনুসন্ধান করো। (সুরা জুমা, ১০)।

অবশেষে যখন তারা আল্লাহকে আহ্বাণকারী রূপে এই আহ্বাণ করতে শুনলেন–“ইন্ফিরু ফি সাবীলিল্লাহ”–তোমরা আল্লাহর রাহে বেরিয়ে পড়ো, (সুরা তওবা, ৩৮) এবং “কূমূ ইলা জান্নাতিন্ আরযুহাস সামাওয়াতু অল্ আরদু”–তোমরা সেই জান্নাতের দিকে উঠে পড় যার প্রস্থ্ হল আসমান-জমীনের দূরত্ব-সমান, তখন তারা ব্যবসা-বাণিজ্য চাষাবাদ এবং সকল শিল্পকর্ম ছেড়ে দিলেন; আর আল্লাহর রাহে জেহাদের জন্য বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁরা পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ঘরবাড়ী এবং দেশভুই সব ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ রাহে বেরিয়ে গেলেন।

আর তাঁরা এরূপ করবেনা কেন? তাঁরা তো তাঁদের নবীকে (স) এ কথা বলতে শুনেছেন–“লা গাদাওয়াতুন ফি সাবীলিল্লাহি আউ রাওহাতুন খায়রুম্মিনাদ্দুনইয়া ওয়ামাফীহা”–নিশ্চয়ই একটা সকাল কিংবা একটা বিকাল আল্লাহর রাহে অবস্থান করা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যস্থিত সব কিছুর চেয়ে উত্তম। তারা নবীকে (স) এ কথাও বলতে শুনেছেন–“অল্লাযি নাফসু মুহাম্মাদিন বিইয়াদিহি লা অদাদ্তু আন আগ্যু ফী সাবীলিল্লাহি ফাউক্তালু ছুম্মা আগযু ফাউক্তালু ছুম্মা আগযু ফাউক্তালু” দোহাই সেই আল্লাহ পাকের যার হাতে মুহাম্মদের জীবন– আমি অবশ্যই চাই– আল্লাহর রাহে আমি যুদ্ধ করে শহীদ হই, তারপর জীবিত হয়ে আবার যুদ্ধ করে

শহীদ হই; তারপর জীবিত হয়ে আবার যুদ্ধ করে শহীদ হই। তারা নবীকে এ কথা বলতেও শুনেছেন –"ইন্না আবওয়াবাল জান্নাতি তাহ্তা যিলালিস সুয়ুফি"–নিশ্চয়ই স্বর্গের দুয়ার তরবারীর ছায়াতলে। তারা তাকে আরো বলতে শুনেছেন "ইন্না মুকামা আহদিকুম ফী সাবীলিল্লাহি আফদালু মিন সালাতিহি ফীবায়তিহি সাবইনা আমান" – আপন গৃহের মধ্যে সত্তর বছর ধরে নফল নামাজ আদায় করার চেয়ে তোমাদের কারুর আল্লাহর রাহে সামান্য সময় অবস্থান করা উত্তম।

একদিন নবী করীম (স) মুশরিকদের সঠিক তথ্য জানার জন্য শত্রুর রাজ্যে মুসলমানদের একটি দলকে পাঠানোর ইচ্ছা করলেন।

তিনি জানতেন যে, সেটা ছিল শত্রুর রাজ্য। আর মুশরিকরা থাকতো ওঁত পেতে। সুতরাং তিনি এমন দশজন লোক চয়ন করে নিলেন যারা পার্থিব জীবনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না, আর তারা মরণকেও অপছন্দ করতেন না। তিনি আসিম বিন সাবিত আনসারীকে (রা) তাদের দলের আমীর বা নেতা করে দিলেন।

এসব লোকেরা তাদের পরিরার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধবকে শেষ বিদায় জানালেন। কেননা তারা জানতেন যে, তারা শত্রুর রাজ্যের দিকে যাচ্ছেন। আর মুশরিকরা তো থাকতো ওঁত পেতে।

মুসলিম বাহিনী তাদের পরিবার-পরিজন, সন্তান-সন্ততি এবং বন্ধু-বান্ধব সবাইকে এই বলে বিদায় নিলেন – হে প্রিয় জনেরা! তোমাদেরকে আল বিদআ! আগামী দিনে রোজ কিয়ামতে দেখা হবে।

তারা মদীনা থেকে যাত্রা করলেন এবং আল্লাহর রাহে চলতে চলতে অবশেষে এক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন; একে বলা হয় 'আলহাদা' যা মক্কা ও আসফানের মাঝখানে।

বনু লেহইয়ানের দিকে কোন এক ব্যক্তি দ্রুত বেগে চলে গেল; আর তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল– তোমরা কি জানো মুসলমানদের একদল আলহাদাতে এসেছে?

তারা বললো, কসম আল্লাহর! আমরা তো জানিনা, আর আমাদের কাছে তাদের কোন তথ্য নাই। লোকটি বলল, আল্লাহর শপথ! তারা আলহাদায় আছে। তোমরা অবশ্যই তাদেরকে দেখেছ। আল্লাহর কসম! আমি আমার এই দুটো চক্ষু দিয়ে দেখেছি। আমি তাদের সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে এসেছি। তোমরা তাদের ব্যাপারে তোমাদের মতামতটা জানাও।

তারা বললো–তোমাকে উত্তম বিনিময় দেওয়া হোক। ওহে ভাই! অমুকের ছেলে। তারা সংখ্যায় কত? সে বলল "আমি মনে করি তারা দশজনের বেশী হবে না।" তারা বললো তা হলে তো তাদের মুকাবিলায় একশত লোক লাগবে। কেননা তাদের মাত্র একজন এদের মধ্য থেকে দশজনের সমান হয়ে থাকে তুমি কি তাদের রবের এ কথা শোন নাই? "ইয়া আইয়ু হান্নাবীয়ু! হার্‌রিদিল্ মু'মিনীনা আলাল্ কিতালি ইই্‌য়াকুম্ মিনকুম ইশরুনা সাবিরুনা য়াগলিবু মিআতইনি অ ইই্‌য়াকুম মিনকুম মিআতুন্ য়াগলিবু আল্‌ফাম্ মিনাল্ লাযীনা কাফারু বি আন্নাহুম কাওমুল্লা ইয়াফ কাহুন।" অর্থাৎ "ওহে নবী! তুমি ঈমানদার লোকদেরকে যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত কর। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে তাহলে তারা দু'শ লোকের উপর বিজয়ী হবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে এক শত জন লোক থাকে তাহলে তারা

কাফেরদের মধ্যে এক হাজার লোকের উপর বিজয়ী হবে। কেননা তারা এমন এক জাতি যারা বোঝেনা। (সুরা আনফাল, ৬৫)। তোমরা কি দেখ নাই? তারা বিগত দিনে কেমন করে তিনশ'র কিছু বেশী হয়েও কুরাইশ বাহিনীকে হারিয়ে দিয়েছিল? আর তাদের মস্ত বড় সরদার এবং নেতাদেরকে মেরে দিয়েছিল।

দোহাই আল্লাহর! আমরা কুরাইশ দলপতি ইকরামার বাবাকে ভুলতে পারবো না। আমরা ভুলতে পারবো না ওলিদের বাবাকে। ভুলতে পারবো না তার ছেলেকে?

ওহে বদরের নিহত ব্যক্তিরা! আমাদের ঘাড়ে তোমাদের কত পাওনা আর কত দায়িত্ব চেপে বসেছে! ভাইয়েরা! আপনারা উঠুন! আমরা বদরের প্রতিশোধ নেবই।

বনু লেহইয়ান থেকে একশত লোক উঠে দাঁড়ালো আর বললো চলুন শত্রুদের দিকে, আলহাদার দিকে, যেখানে আমরা বদরের প্রতিশোধ নেব।

তারা সেই দশজন লোকের কথা এভাবে জিজ্ঞাসা করতে করতে যাত্রা করল– ওগো তোমরা কি ইয়াসরিবের কতিপয় লোকজনকে দেখেছো? তোমরা কি কাউকে নামায পড়তে দেখেছো?

তারা বালুতে তাদের পায়ের দাগ দেখে চলতে লাগল; আর তাতে তারা দারুণ খুশী হল। যখন হযরত আসিম এবং তার সাথীরা তাদের টের পেয়ে গেলেন তাঁরা একটা উচু জায়গায় আশ্রয় নিলেন আর আবু লেহয়ানের লোকেরা তাদেরকে ঘিরে ফেলল।

তারা বলল, তোমরা নিচে নেমে এসো, হাত উঁচিয়ে আত্মসমর্পণ কর? আমরা তোমাদেরকে কথা দিচ্ছি, ওয়াদা করছি– "আমরা তোমাদের কাউকে হত্যা করবো না।"

কিন্তু হযরত আসিম (রা) জানতেন যে, নিশ্চয় যারা কাফের তাদের নেই কোন দায়িত্ব জ্ঞান এবং নেই কোন অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির মূল্য। তাদের নেই কোন ওফাদারী এবং আমানতদারী! এমন কোন জিনিস নাই যা গাদদারী এবং বিশ্বাসঘাতকতা থেকে তাদেরকে বাধা দিতে পারে।

হযরত আসিম (রা) আল কুরআনে কাফির ও মুশরিকদের সম্পর্কে আল্লাহকে এ কথা বলতে শুনেছেন, "লা ইয়ারকুবুনা ফী মুমিনিন ইল্লাও ওলা যিম্মাতান ইন্নাহুম লা আয়মানা লাহুম"–তারা মুমিন মুসলিমের সাথে আত্মীয়তার এবং অঙ্গীকারের কোন মর্যাদা রক্ষা করেনা। (সুরা তওবা, ১০) এরা এমন লোক–"যাদের প্রতিশ্রুতি কোন প্রতিশ্রুতিই নয়।" (সুরা তওবা, ১২)

তারা বিগত দিনে নবীজীর (স) কাছে এসে কি এ কথা বলে বলেনি যে, আপনি আমাদের সাথে এমন কতিপয় লোক পাঠিয়ে দেন যারা আমাদেরকে কুরআন– সুন্নাহ শিক্ষা দেবেন?

তাই তো নবীজী (স) তাদের নিকট সত্তর জন আনসারকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাদেরকে বলা হতো কুররা (কুরআন শিক্ষকের দল)। তাঁরা তাদের সামনে উপস্থিত হলে গন্তব্য স্থলে পৌঁছার আগেই তাদেরকে হত্যা করেছিল।

হযরত আসেম (রা) এ কথা ভালই জানতেন। ফলে তিনি কোন কাফেরের উপর ভরসা করলেন না এবং কারুর দ্বারা ধোঁকাও খেলেন না। তিনি তাদের উপর আস্থা রাখতে অস্বীকার করলেন। কেননা তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করেনা, আখেরাতকে বিশ্বাস

করেনা, সুতরাং এমন কি জিনিস আছে যা গাদদারী আর বিশ্বাসঘাতকতা করা থেকে তাদেরকে বাধা দেবে? আর এমন কি জিনিস আছে যা তাদেরকে অঙ্গীকার পালন করার জন্য উৎসাহিত করবে?

হযরত আসেম (রা) বললেন– হে লোক সকল! আমি কাফিরের যিম্মাদারীতে নিচে নামতে পারবো না। হে আল্লাহ! তোমার নবীকে আমাদের ব্যাপারে জানিয়ে দাও।

মুশরিকরা এ কথা শুনে রেগে গেল; তারা মুসলমানদের উপর তীর ছুড়লো; তাদের উপর শর নিক্ষেপ করল; তারা আসেমকে (রা) হত্যা করল; এবং তাঁর সাথে আরো ছয় জনকেও হত্যা করল।

আল্লাহ তায়ালা হযরত আসেমকে (রা) শাহাদাতের মর্যাদা দান করলেন। আর তিনি একমাত্র আল্লাহর দায়িত্ব ও যিম্মাদারীতে রয়ে গেলেন; ফলে আল্লাহ পাক তাঁর জন্য সামিয়ানার মত করে মৌমাছির ঝাঁক পাঠিয়ে দিলেন; তারা তার সহায়তা করতে লাগলো। তারা তাঁর দেহকে পাহারা দিতে থাকলো! হযরত আসেম (রা) ইতোপূর্বে কুরাইশদের একজন দলপতিকে হত্যা করেছিলেন; তাই তারা তাঁর নিকট এক লোক পাঠিয়ে দিল; যে আসেম সম্পর্কে সংবাদ নিয়ে আসবে যাতে তারা জানতে পারে যে, আসেমকে হত্যা করা হয়েছে।

আল্লাহ পাক তাঁর যিম্মায় থাকা হযরত আসেমের (রা) দেহ কাফেরদের ছুঁইতে দিলেন না। যেহেতু হযরত আসেম (রা) কাফেরের যিম্মায় ও দায়িত্বে নামতে অস্বীকার করেছিলেন। কাফেররা দেখলো– মৌমাছিরা তাকে সাহায্য করছে; তারা ভয় পেয়ে গেলো। তারা তাঁর দেহ হাতে পাওয়ার কোন উপায় বের

করতে পারল না। তারা ফিরে গেল। তারা তাঁর দেহ থেকে কিছুই কেটে নিতে সক্ষম হল না।

যখন হযরত আসেমের (রা) সাথীরা দেখতে পেলেন যে হযরত আসেম নিহত হয়ে গেছেন আর তারাও যখন নিহত হয়ে যাচ্ছেন তখন মুশরিকদের দ্বারা সংঘটিত এ খবর কে জানতে পারবে? আর কেই বা এমন আছে যে, নবীর কাছে তাদের এ অবস্থা জানিয়ে দিবে? নবীজী তো তাদেরকেই পাঠিয়েছেন মুশরিকদের খবরাদি জানার জন্য।

হযরত আসেম জেহাদ করেছেন এজন্য তো তাঁর পুরস্কার আছে। তাঁর সাথীরাও জেহাদ করেছেন, তাই তাঁদের জন্যও পুরস্কার আছে; তারা সবাই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি চেয়েছেন। আর আল্লাহ তায়ালা সবাইকে পুণ্যের ওয়াদা করেছেন।

এদিকে বাকী আর তিনজন যারা কাফেরদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির উপর নিচে নেমে আসেন তারা হলেন হযরত খুবাইব (রা), যায়েদ ইবনে দাসিন্না (রা) এবং অন্য এক ব্যক্তি।

মুশরিকরা এই তিন জনকে হাতের নাগালে পেয়ে ধনুকের ছিলা খুলে তা দিয়ে তাদেরকে বেঁধে ফেলল। তৃতীয় ব্যক্তি বলল, সে কি? এই তো প্রথম গাদদারী। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের সাথে যাবোইনা। নিশ্চয়ই এখন আমার আদর্শ আগের এই ব্যক্তিদের অর্থাৎ যারা নিহত হয়েছেন।

তাঁরা তাকে নিয়ে টানাটানি করতে লাগল এবং সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য খুব চেষ্টা করতে থাকল; কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন; ফলে মুশরিকরা তাঁকে হত্যা করল। অবশেষে তারা বাকী দুজন খুবাইব (রা) এবং যায়েদ ইবনে দাসিন্নাকে (রা) সাথে নিয়ে গেল; অবশেষে তারা মক্কায় উভয়কে বিক্রি করে দিল।

হযরত খুবাইব বদরের দিন যুদ্ধে হারিস ইবনে আমেরকে হত্যা করেছিলেন; সুতরাং যখন হারিসের ছেলেরা শুনলো তাদের পিতার হত্যাকারী খুবাইব বনু লেহইয়ানদের নিকট বন্দী হয়ে আছে; তারা তাদের কাছে চলে আসল এবং তাদের বাপের বদলায় তাকে হত্যা করার জন্য কিনে নিল।

খুবাইব (রা) বনু হারিসদের নিকট বন্দী হয়ে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু জানতে পারছিলেন না তাঁকে কখন হত্যা করা হবে। তবে তাঁর জন্য হত্যা অবধারিত হয়ে গিয়েছিল।

সুতরাং তিনি আপন রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য পাকছাফ হওয়ার ইচ্ছা করলেন। তিনি একটি ক্ষুর চেয়ে নিলেন।

হারেসের কোন এক মেয়ের একটি বাচ্চা শিশু তার অসাবধানতায় হাটতে হাটতে খুবাইরের নিকট চলে গেল। কিন্তু বাচ্চা শিশুরা তো জানেনা তাদের কে শত্রু কে মিত্র? আর হযরত খুবাইব তো হারেসের ছেলে-মেয়ে এবং বাচ্চা শিশুদের ব্যাপারে অঙ্গীকার মুক্ত ছিল। তবে হযরত খুবাইব ছিলেন কোমল হৃদয়ের একজন দয়ালু ব্যক্তি। আর মুমিন ব্যক্তি হয়ে থাকেন সৎ এবং মহানুভব ব্যক্তি; তিনি দুর্বলদের প্রতি হন দয়ালু। ছোটদের উপর তিনি স্নেহশীল হন; তিনি কারুর সাথে না গাদ্দারী করেন আর না পাষাণ প্রাণ হন।

আর আমাদের নবীজী (স)ও ছিলেন নরম হৃদয়ের বন্ধুজন; তিনি ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে ভালবাসতেন– তাদেরকে চুমো দিতেন। হযরত খুবাইব (রা) বাচ্চাটিকে পেয়ে আনন্দিত হলেন; তিনি তাকে উঠিয়ে নিজের উরুর উপর বসালেন। এখন তাঁর হাতে শাণিত ক্ষুর। বাচ্চাটির মা তাকিয়ে দেখল সে খুবাইয়েবের উরুর উপর বসা; সুতরাং সে আতংকিত হয়ে পড়ল আর ভাবল হায়!

হায়! কি ভয়ংকর দৃশ্য। বাচ্চা শত্রুর উরুর উপর; সে তো আগামীকাল নিহত হচ্ছে! তার হাতে শাণিত ক্ষুর। শত্রুর জন্য এতো সুবর্ণ সুযোগ! সে বাচ্চা শিশুটিকে জবাই করে নিজ প্রাণের দুঃখের উপশম করবেই।

হায় অভাগিনী কাফের নারী! তুমি মুমিন মানুষের পরিচয় জান না। তার অঙ্গীকার পালন করার কোন অভিজ্ঞতাই তোমার নেই। তুমি জাননা তার মহানুভবতা ও উদারতা। তুমি জান না যে, মুমিন ব্যক্তির মহত্ত্ব এবং তার ধর্ম কি। যদি যুদ্ধের ময়দানে শিশু-কিশোর এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাকে হত্যা করতে অথবা বৃদ্ধ এবং নারীদের উপর হামলা করতে ধর্ম নিষেধ করে থাকে তাহলে গৃহ ও বাড়ীর মধ্যে ছোট শিশুকে হত্যা করা কেমন করে সম্ভব?

হযরত খুবাইব (রা) মহিলার হৃদয়ের আতংক বুঝতে পারলেন। তিনি বললেন– বাচ্চাকে আমি হত্যা করব বলে তুমি ভয় পাচ্ছ? না! না। আমি কখনও এ কাজ করব না।

খুবাইব বনু হারিসেদের নিকট বন্দী ছিলেন– তিনি বন্দী ছিলেন তার শত্রুদের নিকট। তিনি বিগত দিনে তাদের এক পিতাকে হত্যা করেছেন, সুতরাং তারাও তাকে আগামী কাল হত্যা করতে যাচ্ছে।

খুবাইব (রা)কে তেমন কোন খাদ্য দেয়া হত না কেবল এতটুকু দেয়া হত যাতে সে মারা না যায়। কেননা যদি সে না খেতে পেয়ে মারা যায় তাহলে তারা তাকে কেমন করে হত্যা করবে? আর কেমন করে তারা তাদের অন্তরের যে জ্বালা আছে তার উপশম ঘটাবে?

কিন্তু হযরত খুবাইব ছিলেন তাঁর রবের মেহমান। তিনি কি তাঁর ঘরবাড়ী, পরিবার-পরিজন, তার অন্ন, জল, তার রবের রাহে ত্যাগ করে আসেন নাই? নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা সর্বজ্ঞ।

হযরত খুবাইব (রা) ইন্দ্রিয় ও বস্তু জগতের গণ্ডি থেকে আত্মা এবং অদৃশ্য জগতের চিন্তায় বিভোর তিনি তাঁর রবের সাক্ষাৎ লাভের প্রতীক্ষায় আছেন। প্রতি মুহূর্তে শাহাদাতের অপেক্ষা করছেন। জীবনের সকল আশা-ভরসা ছিন্ন করেছেন; দুনিয়ার রাজ্য থেকে তিনি বেরিয়ে এসেছেন। তাই তাঁর কাছে জান্নাত থেকে আসতো উপহার উপঢৌকন। দয়ালু প্রভুর কাছ থেকে আসতো মেহমানদারীর সামগ্রী।

তাঁর কাহিনী হযরত মারইয়ামের (আঃ) কাহিনীর মত। "কুল্লামা দাখালা আলাইহা যাকারিইয়াল মিহ্রাবা ওয়াজাদা ইন্দাহা রিযকান্, কালা ইয়া মারয়ামু আন্না লাকি হাযা কালাত হুয়া মিন ইনদিল্লাহ; ইন্নাল্লাহইয়রযুকু মাইইয়াশাও বি গাইরি হিসাব।" অর্থাৎ যখন মেহরাবের মধ্যে তার কাছে হযরত যাকারিয়া ঢুকে তাঁর কাছে আহার সামগ্রী দেখতে পেতেন তখন বলতেন ও মরিয়াম! এ সব তোমার জন্য কোথা থেকে আসলো? মরিয়ম বলতেন, এ তো আল্লাহর কাছ থেকে আসে। আল্লাহ্ যাকে চান তাকে, বেহিসাব রেযেকের ব্যবস্থা করে থাকেন।

লোহার শিকলে বাঁধা বন্দী হযরত খুবাইবের নিকট গর মউসুমের নানা ফল-ফলারী আসতো; অথচ কেউ জানতো না এই ফলমূল তাঁর কাছে কোথা থেকে আসছে।

হারিসের মেয়ে বলল– কসম আল্লাহর খুবাইবের চেয়ে কোন উত্তম বন্দীকে আমি দেখি নাই। আল্লাহর কসম। আমি একদিন তাঁকে আঙুরের ছড়া খেতে দেখেছি। অথচ সে তো লোহার জিঞ্জিরে

বাঁধা থাকতো; আর তখন মক্কায় কোন ফল পাওয়া যেতনা। সে বলতো অবশ্যই তা এমন রিযিক যা আল্লাহ খুবাইবকে খাওয়াতেন। বনু হারিসরা যা দেখেছিল তা ছিল হযরত খুবাইবের সৌজন্যে এবং আল্লাহর কাছে তাঁর কারামত এবং সম্মানের জন্য। কিন্তু এত সব কিছুও বনু হারিসদের হত্যা করা থেকে এতটুকু বাধা দিতে পারে নাই।

অবশ্য দুশমনী এবং শত্রুতা মানুষকে অন্ধ ও বধির করে ফেলে। নিশ্চয় কাফেররা অন্ধ ও বধির হয়ে যায়। বনু হারিসরা খুবাইবকে হত্যা করার জন্য হেরেম থেকে বের করে হিল্লের মধ্যে এনেছিল। আচ্ছা! হিল্লের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যাকে লোকেরা ভয় করে অথবা হিল্লের মধ্যে এমন কি কেউ আছে যে লোকদেরকে দেখে। আচ্ছা। হিল্লের মধ্যে জুলুম নির্যাতন করা কি বৈধ আর হেরেমের মধ্যে অবৈধ?

আসলে কিন্তু কুফরী মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। শয়তানই মানুষকে অন্ধ ও বধির করে তোলে। হযরত খুবাইব (রা) যখন মৃত্যু সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে গেলেন তখন বললেন– তোমরা আমাকে দু' রাকা'আত নামায আদায়ের জন্য ছেড়ে দাওনা? তারা তাকে ছেড়ে দিল; অতঃপর তিনি দু' রাকা'আত নামায আদায় করলেন।

অতঃপর যখন তিনি নামায শেষ করলেন তখন বললেন আমি চেয়েছিলাম আরো বেশী করে নামায আদায় করে নেই। আমি চেয়েছিলাম আমার রবের সামনে দীর্ঘ সময় দাঁড়াই কিন্তু আমার শংকা হচ্ছিল তোমরা বলে না বসো যে খুবাইব মৃত্যু দেরী করার ইচ্ছায় নামাজ লম্বা করছে– খুবাইব হত্যার ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছে।

ওগো তোমরা দেখ! আমি তো সেই ব্যক্তি যে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন তোমাদের যা ইচ্ছা তাই কর। অতঃপর তিনি বললেন– "হে আল্লাহ! তুমি এদেরকে গুণে গুণে হিসাবে রেখো; নির্মমভাবে হত্যা করো, আর এদের কাউকে বাকী রেখো না।" এরপর তিনি আবৃত্তি করলেন–"লাস্‌তু উবালী হীনাউক্‌তালু মুস্‌লিমা। আলা আইয়ি জানবিন্‌ কানা লিল্লাহি মাসরায়ী "

নাই পরোয়া মুসলিম হয়ে হত হবো যবে,

যে পাশে মোর আল্লাহর লাগি ফেলায়ে দেওয়া হবে।

তারা খুবাইবকে ফাঁসির কাষ্ঠের উপর উঠিয়ে তাঁকে তীর মারার জন্য চারিপাশে দাঁড়িয়ে গেল, আর আনন্দ করতে থাকল।

আহা! কতই না সুন্দর কাষ্ঠের উপর আরোহণকারী ব্যক্তি। আর কতই না কুৎসিত আনন্দকারীরা। আহা! তারা কি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছে যিনি নিজের জীবনকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন। যিনি পরোয়া করেন নাই মৃত্যু তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ুক অথবা মৃত্যুর উপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আহা! তারা কি এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠেছেন যিনি গাদদারী করেন নাই, বিশ্বাস ভঙ্গ করেন নাই, মিথ্যা বলেন নাই, যুলুম করেন নাই; আর একটি বারও তাদের কাছে তাকে ছেড়ে দেওয়ার আকুতি জানান নাই।

আহা! তারা এমন এক ব্যক্তিকে নিয়ে স্ফূর্তি করতে চলেছে যিনি তাদের উপর আস্থা রেখেছিলেন; কিন্তু তারাই তাঁর সাথে

বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যিনি তাদেরকে বিশ্বস্ত মনে করেছিলেন; অথচ তাঁর সাথে তারাই বেঈমানী করেছে।

তারা যখন খুবাইবকে কাষ্ঠ খণ্ডের উপর উঠিয়ে তীর মারার আয়োজন করল তখন তারা নবীজীর উপর তাঁর মমতা ও ভালবাসার পরীক্ষা করতে চাইল।

আর সেটি ছিল এমন এক অবস্থা যখন তীর তাঁকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছিল, তাঁর চামড়া ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছিল তাঁর দেহের মাংস কেটে টকুরো টুকুরো করে দিচ্ছিল। এটা এমন স্থান যেখানে বন্ধু তার বন্ধুকে ভুলে যায়, মানুষ তার পিতামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নি এবং স্ত্রী-পুত্র সবাইকে ভুলে যায়।

তারা খুবাইবকে এই বলে আহ্বাণ করছিল– হে খুবাইব! আল্লাহর কসম করে আমাদেরকে জানাও তো তোমার জায়গায় মুহাম্মদ হলে তোমার কি ভালো লাগতো? এ কথা শুনে হযরত খুবাইব (রা) উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলেন আল্লাহর কসম– এটা কতই না প্রিয় জিনিস হবে যে, সেই একটি কাঁটার বিনিময়ে আমি নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেই যে কাঁটাটি নবীজীর পায়ে বিদ্ধ হবে।

তারা এ কথা শুনে দারুণ বিস্মিত হয়ে গেল, তাদের অন্তরই তাদের ধিক্কার দিল। কিন্তু তবুও তারা মেরে ফেলল খুবাইবকে।

তোমার উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। তুমি প্রেমিকদের পন্থা অবলম্বন করেছো, তুমি পরবর্তীদের মধ্যে এক স্মৃতি রেখে চলে গেছো।

বালকের তরবারীতে আবু জেহেলের রক্ত

সাইয়্যেদেনা আবদুর রহমান বিন আউফ (রা) বলেন, জঙ্গে বদরের দিন আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম; আমার ডানে-বামে ছিল মু'আয ইবনে আফরা এবং মুআওঅজ বিন আফরা নামে দুজন আনসারী বালক। দুজন বালকের মধ্যে একজন আমার দিকে তাকাল, এবং তার সঙ্গী থেকে গোপনে আমাকে বলল চাচাজী! আপনি আবু জেহেলকে চেনেন কি? আমি বললাম 'হ্যাঁ! চিনি, আচ্ছা ভাইপো! তুমি তাকে নিয়ে কি করতে চাও?
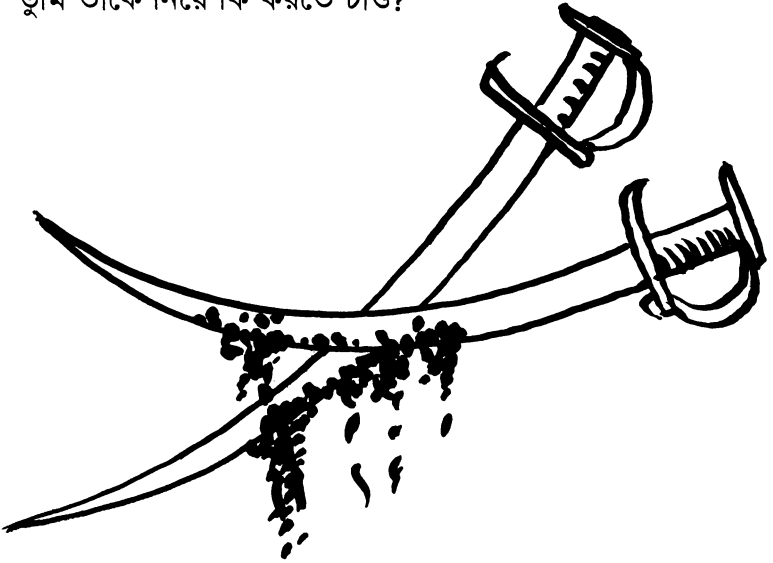
সে বলল–'আমি জেনেছি সে নাকি রাসূলুল্লাহকে গালি দেয়। চাচাজী! তাকে আপনি আমাকে দেখিয়ে দিন? কেননা আমি

আল্লাহপাকের সাথে অঙ্গীকার করেছি যে যদি তাকে দেখতে পাই তাহলে হয় আমি তাকে হত্যা করবো, না হয় তার সামনে আমি মৃত্যু বরণ করবো।

অপর বালকটি তার সঙ্গী থেকে গোপনে আমাকে বলল–চাচাজী! আবু জেহেলকে কি আপনি আমাকে দেখিয়ে দিবেন? কেননা আমি আল্লাহর সাথে প্রতিজ্ঞা করেছি যদি আমি তাকে দেখতে পাই তাহলে আমি আমার তরবারী দিয়ে তাকে হত্যা করে ফেলবো। এমন সময় হঠাৎ আমি দেখলাম আবু জেহেল প্রকাশ্যে এসেছে। আমি বললাম–"তোমরা কি দেখতে পাওনি? এই তো আবু জেহেল! এই তো নিন্দিত সেই লোকটি।"

অমনি দুটো বালক বাজ পাখীর মত তীব্র বেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আঘাত করল। অতঃপর তারা নবীজীর (স) কাছে চলে গেল এবং তাঁকে খবরটা জানালো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন–তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? উভয়ের মধ্যে প্রত্যেকেই বলল, আমিই তাকে হত্যা করেছি। তিনি বললেন– আচ্ছা তোমরা কি তোমাদের উভয় তরবারী মুছে ফেলেছো?

উভয়ে জওয়াব দিল– না। অতঃপর নবী করীম (স) দুখানা তরবারী দেখলেন; তারপর তিনি বললেন–তোমরা দুজনই তাকে হত্যা করেছো।

যুদ্ধে যাওয়ার কুস্তি

রাসূলুল্লাহ (স) যখন মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বদর প্রান্তরের দিকে রওয়ানা হলেন তখন এক বালক গোপনে তাঁর সঙ্গী হল, নাম তার উমায়ের, বয়স ১৬।

উমায়ের আশংকা করছিল নবী করীম (স) তাকে মেনে নেবেন না; কেননা সে বয়সে ছোট। তাই সে চেষ্টা করছিল যাতে কেউ তাকে দেখতে না পায়; সে লুকিয়ে লুকিয়ে চলছিল।

কিন্তু তার বড় ভাই সা'দ বিন আবী অক্কাস তাকে দেখে ফেললেন। তিনি তাকে বললেন, "ভাই! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি জন্য লুকিয়ে লুকিয়ে চলছিল?"

উমায়ের বলল–"আমার ভয় হচ্ছে যে রাসূলুল্লাহ আমাকে যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে দিবেন; কেননা আমি বয়সে ছোট। অথচ আমি যুদ্ধে বের হতে চাই; হয়তো আল্লাহ আমাকে শাহাদাত দান করবেন।

হলও তাই উমায়ের যা ভয় করেছিল। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তার দিকে তাকালেন আর দেখলেন সে বয়সে ছোট; আর যুদ্ধ তো বাচ্চা কাচ্চা আর ছোট ছেলেদের কাজ না; তারা যুদ্ধে কী করবে? এতো বিরাট কাজ; যার দায়িত্ব বড়দের উপর।

কিন্তু উমায়ের তো চায় নাই ফিরে যেতে; কিংবা ঘরে বসে থাকতে: সে তো চায় নাই তার সমবয়সী আরো বন্ধু-বান্ধবদের

সাথে মদীনায় থেকে খেলাধুলা করতে! সে তো চেয়েছে আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণ করতে!

উমায়ের তো রাসূলুল্লাহর নাফরমানী করেনা, অবাধ্যতাও করেনা; সে তো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই চায় না, রাসূলুল্লাহর নাফরমানী করলে সে কি কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবে?

উমায়েরের দারুণ দুঃখ ও দুঃশ্চিন্তা হল সে তো যুদ্ধ করার মত বয়সে পৌঁছতে পারে নাই। অথচ তার আকাঙ্ক্ষা শহীদ হওয়ার; তাঁর বাসনা আল্লার রাহে মৃত্যুবরণ করার। সে জান্নাতে যাওয়ার অভিলাষ করছে, যে জান্নাতকে সে অদূরে দেখতে পায়; কিন্তু সে কেমন করে সেখানে পৌঁছবে? কেননা সে তো এখনো যুদ্ধ করার মত বয়সে পৌঁছে নাই। এ সব কিছু উমায়েরের উপর চাপ সৃষ্টি করছিল। তাই তার ছোট অন্তর কেঁদে দিল।

উমায়ের যখন কেঁদে ফেলল তখন তার জন্য আল্লাহর রাসূলের (স) অন্তর নরম হয়ে গেল; রাসূল (স) ছিলেন কোমল প্রাণ অতি নরম মনের মানুষ। তাই তিনি তাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন।

রাসূলুল্লাহ (স) যখন উমায়েরকে অনুমতি দিলেন তখন তোমরা তার সেই আনন্দ আর খুশীর প্রশ্ন ভুলো না! মনে হল সে যেন জান্নাতের টিকিট পেয়ে গেছে।

উমায়ের তাঁর ভাই এবং অন্যান্য মুসলমানদের সাথে বেরিয়ে পড়লো। তারা সবাই ছিল বয়সে বড় এবং শক্তিশালী; উমায়ের যেমন চেয়েছিল তেমন হয়ে গেল। সে যুদ্ধে নিহত হয়ে শহীদ হয়ে গেল। সে অধিকাংশ যুবক এবং বয়স্ক লোকদের উপর

অগ্রগামী হয়ে গেল। আল্লাহ উমায়েরে উপর সন্তুষ্ট হোক এবং তাঁকে সন্তুষ্টির পাত্র করুক।

আরেকবার রাসূলুল্লাহ যখন ওহুদ প্রান্তরের দিকে কুরাইশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য বের হলেন তখন তাঁর সাথে মদীনা থেকে দুজন বালকও রওয়ানা দিল। তারা আল্লাহর রাহে জেহাদ করতে পছন্দ করত। তারা ছিল বয়সে ছোট। তখনও বয়স পনেরো পার হয় নাই। ফলে আল্লাহর রাসূল তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। যেহেতু তারা ছিল ছোট, লড়াই করার মত বয়সে তারা পৌঁছতে পারে নাই। তারা তো আসবাবপত্রের মত তাদেরকে নযরদারী এবং পাহারা দেওয়ার জন্য বড়দেরকেও মশগুল ও ব্যস্ত থাকতে হবে।

এ সব বালকদের মধ্যে এক ছেলে ছিল যার নাম ছিল রাফে ইবনে খুদাইজ। সে বয়সে পনেরো বছরের কম ছিল; সে আগ্রহাতিশয্যে ডিঙ্গি মেরে লম্বা হচ্ছিল যাতে লোকে মনে করে সে বড় হয়েছে; যুদ্ধ করার মত বয়সে পৌঁছেছে, ফলে তাকে অল্প বয়স এবং দুর্বল বলে ধারণা করা হবে না।

কিন্তু আল্লাহর রাসূল তাঁকে ফিরিয়ে দিলেন। কেননা তিনি চিনে ফেললেন যে সে বয়সে ছোট আর সে লম্বা হওয়ার জন্য ডিঙ্গি মারছিল।

পরে তার আব্বা তার জন্য সুপারিশ করলেন আর বললেন– “হে আল্লাহর রাসূল আমার এই ছেলে রাফে একজন তীরন্দাজ।” তখন আল্লাহর রাসূল (স) অনুমতি দিলেন। রাসূলুল্লাহ যখন অনুমতি দিলেন তখন রাফে ঈদের দিন ঈদগাহের দিকে নূতন পোষাকে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে পড়া বালক-বালিকাদের চেয়েও অধিক খুশী হয়েছিল।

রাফের বয়সী আর একটা ছেলে ছিল নাম তার সামুরা ইবনে জুনদুব। রাফের পর তাকে রাসূলের (স) সামনে পেশ করা হল। তাকেও আল্লাহর রাসূল অল্প বয়সের জন্য ফিরিয়ে দিলেন। তখন সামুরা বলল, আপনি রাফেকে অনুমতি দিলেন আর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন, আমি যদি তার সাথে কুস্তি করি তাহলে আমি তাকে কাত করে ফেলতে পারি।

তখন রাসূলুল্লাহ সামুরা এবং রাফেকে কুস্তি লড়তে হুকুম করলেন। সামুরা যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনিই রাফেকে পাছড়িয়ে ফেলে দিল। ফলে সে মুজাহিদদের সারিতে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করল। আল্লাহর রাসূল (স) সামুরাকে যুদ্ধে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। সামুরা বেরিয়ে পড়ল; এবং ওহুদের দিন আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করল। রাফে এবং সামুরার প্রতি আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট থাকুক; তিনি আমাদেরকে তাদের অনুসরণ করার তওফীক দান করুক।

দাঁত দিয়ে পেরেক তোলা

আল্লাহর রাসূল (স) মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য বদর প্রান্তরে গমন করলেন মুসলমানদের মধ্যে যারা মদীনায় ছিলেন তারাও তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লেন।

আল্লাহর রাসূল (স)-এর সাথে তিনশরও কিছু বেশি সাহাবা (রা) রওয়ানা হলেন; কিন্তু অনেক মুসলমান তা জানতে পারলেন না। মুসলমানদের মধ্যে কিছু লোক উট চড়াতে গিয়েছিলেন; কিছু লোক ক্ষেতে পানি সেচন করতে বেরিয়ে ছিলেন, তাদের কেউ কেউ বাগান পাহারা দিতে গিয়েছিলেন, আবার কেউ দোকান চালাতে গিয়েছিলেন। মোটকথা তারা যার যার প্রয়োজনে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। কেননা তারা ছিলেন শ্রমজীবী এবং খেটে খাওয়া মানুষ। তাই তারা জানত না যে আল্লাহর রাসূল বদরের দিকে-না অন্যদিকে বেরিয়ে পড়েছেন। হযরত আনাস বিন নদরও তেমনি তার কোন এক কাজে গিয়েছিলেন, তিনি বুঝতে পারেননি যে, আজ রাসূল (স) বদরের দিকে বের হচ্ছেন; এ যদি তিনি জানতে পারতেন তাহলে রাসূলুল্লাহ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন থাকতেন না। বরং সারাদিন তাঁর মজলিসে থাকতেন। কেননা তিনি আল্লাহর রাহে জেহাদ করার জন্য ছিলেন দারুণ আগ্রহী এবং আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাওয়ার উপর তিনি ছিলেন একান্ত লোভী।

আল্লাহ তায়ালা বদরে মুসলমানদের সাহায্য করেন। তারা মুশরিকদেরকে জঘন্যভাবে পরাজিত করেছিলেন। এ যুদ্ধে আল্লাহ পাক মুসলমানদেরকে পরপর অনুগামী এক হাযার ফেরেশতা দিয়ে

সহায়তা করেছিলেন। মুসলমানেরা সত্তরজন মুশরিককে মেরে ফেলেন আর তাদের সত্তর জনকে বন্দী করেন। হিশামের পুত্র আবু জেহেল এবং রবীয়ার পুত্র উতবা মারা গিয়েছিল; মারা গিয়েছিল ওলীদ আর শায়েবা।

বদর প্রান্তরে যুদ্ধের দিনটা ছিল পার্থক্য নির্ণয় করার দিন। কাফেরদের উপর দিনটা ছিল অতি কঠিন। আল্লাহ্পাক বদরের সাহাবা কেরামের উপর সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তিনি নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে ক্ষমা করেছেন, এবং বিরাট বিনিময় দিয়েছেন।

হযরত আনাস বিন নদর (রা) যখন জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ বদর প্রান্তরে বের হয়ে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন; মুসলমানরাও তাঁর সাথে বের হয়ে মুশরিকদের সাথে লড়াই করছেন; এবং আরো জানতে পারলেন বদরের এই দিনটা ছিল– সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করার দিন; এ দিনটা ছিল আল্লাহ পাকের বন্ধু আর শয়তানের বন্ধুদের মধ্যে পার্থক্য রচনা করার দিন; এ দিনে মুসলমানদের মুখ হয়েছিল শুভোজ্জ্বল আর মুশরিকদের মুখ হয়ে গিয়েছিল কৃষ্ণ মলিন। এজন্য হযরত আনাস বিন নদর তার অনুপস্থিত থাকার কারণে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। তিনি রাসূলুল্লাহর (স) দরবারে অত্যন্ত অনুতপ্ত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে উপস্থিত হলেন আর তাকে বললেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকলাম; আপনি মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করলেন। আল্লাহ যদি মুশরিকদের যুদ্ধে আমাকে উপস্থিত করাতেন তাহলে আমি কি করতাম তা আল্লাহ অবশ্যই দেখতেন। হযরত আনাস বিন নদর (রা) এমন সুরে একথা বলেছিলেন যার মধ্যে ছিল দুঃখ আর বীরত্বপনা ভরা। এ সুরের মধ্যে ছিল আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং নির্ভরতা ভরা।

মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছেন তারা যদি আল্লাহর উপর কসম করে বসেন তাহলে আল্লাহপাক তাদের কবুল করে নেন, তারা যদি নিজেদের পক্ষ থেকে কথা বলেন তা হলে আল্লাহপাক তাদের সত্যায়ন করেন। হযরত আনাস বিন নদর (রা) ঐ দিনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলেন যে দিন তিনি নিজের মনকে নিরাময় করতে পারবেন আর আপন রবকে সন্তুষ্ট করবেন।

হযরত আনাস বিন নদর (রা) রয়ে গেলেন এমন অবস্থায় যে, কোন খাদ্য ও পানীয় কিছুই তার কাছে ভালো লাগেনা, পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে থেকেও শান্তি পাননা।

মুশরিকরা বদর প্রান্তর থেকে ফিরে গেল; তাদের মধ্য থেকে সত্তর জন নিহত হয়েছিল, আর সত্তর জন বন্দী হয়েছিল। মক্কায় তারা ফিরে গেল; কিন্তু তাদের জন্য দুনিয়া হয়ে গেল অন্ধকারময় আর পৃথিবী হয়ে গেল তাদের জন্য সংকীর্ণ। তারা মক্কায় ফিরে গেল বটে, কিন্তু লজ্জায় ও অপমানে নিজেদের মস্তক উঁচু করতে পারছিলনা; এ কারণে যে, বদর প্রান্তরে তারা জঘন্য রকম পরাজয় বরণ করেছিল।

লোকে কুরাইশদেরকে কী বলবে? মাত্র তিনশত তের জন মানুষ কুরাইশদের এক হাজার অশ্বারোহীকে পরাজিত করেছে। হায় কি আশ্চর্য!

কোথায় রইল কুরাইশদের সেই বাহাদূরী। কোথায় রইল কুরাইশদের সেই অশ্ব পরিচালনার দক্ষতা! আর কোথায় বা থাকল কুরাইশদের ইজ্জত-সম্ভ্রম। দিক দিগন্তে এ অপমানের কথা ভেসে গেল, গোত্রে গোত্রে তা ছড়িয়ে পড়ল; এ নিয়ে মানুষেরা স্থানে স্থানে আলোচনা চালাল। বদরের এ দৃষ্টান্ত মানুষের কাছে কেমন করে

গোপন থাকবে? আবু জেহেলের, আবু ওতবার নিহত হওয়ার কথা সকল কবিলায় কেমন করে লুকানো থাকবে?

কুরাইশরা আগামী মেলার মউসুমে কেমন করে মুখ দেখাবে? মিনায় বা কেমন করে লোকজনের সামনে গর্ব করবে? আর তারা মুহাম্মদ (স) এবং তার সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কে কি বা বলবে? তারা তো তাদের বাহিনীকে গত পরশুই নিকৃষ্টভাবে পরাজিত করে দিয়েছে?

কুরাইশরা এবার এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার উপর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হল। তারা বদর প্রান্তরের এ লজ্জা তাদের থেকে ধুয়ে-মুছে ফেলবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হল এবং আরেকটি যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল আর ভাবল নিশ্চয় এটিই হবে একমাত্র সমাধান, নিশ্চয়ই এটিই হল সুবিবেচিত ও সঠিক ব্যবস্থা।

আল্লাহর রাসূলের (স) কাছে কুরাইশদের মক্কা থেকে যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে আসার খবর পৌঁছে গেল। তিনি সাহাবাদেরকে একত্রিত করলেন, এবং তাদেরকে বললেন তোমরা কী মত পোষণ করছ? তোমরা কি মদীনায় থেকে তাদের মুকাবিলা করবে? না তাদের দিকে বেরিয়ে পড়বে? প্রবীনদের মত হল মুসলমানেরা মদীনায় অবস্থান করে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর এটাই ছিল যা নবীজী মত করছিলেন; আর এটাই ছিল সঠিক রায়।

কিন্তু যুবকরা রায় দিচ্ছিলেন যে, মুসলমানরা মদীনা থেকে বেরিয়ে মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করবে যাতে করে তাদের ধৈর্যশক্তির পরাকাষ্ঠা এবং পরীক্ষার প্রকাশ ঘটে। অবশেষে রাসূলুল্লাহ যুবকদের মতে ফিরে এলেন; এবং মদীনা থেকে বেরিয়ে পড়লেন, পথিমধ্যে (মুনাফেক নেতা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সেনাবাহিনীর প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক নিয়ে পৃথক হয়ে গেল; তার ইচ্ছা

ছিল–আল্লাহর রাসূল (স) যেন মদীনা থেকে না বের হন। তাই সে বলল– "আপনি আমার মতের বিরোধিতা করছেন আর আমাকে ভিন্ন অন্যের মত শুনেছেন? বেশ তাই হোক–আমি চললাম।" সে তার দল-বল নিয়ে চলে গেল।

শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা ছিল সংখ্যায় সাতশ। আর তাঁদের মধ্যে ছিল মাত্র পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী।

রাসূলুল্লাহ (স) (যুদ্ধের কৌশল হিসাবে) আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়েরকে তীরন্দাজদের উপর নেতৃত্ব প্রদান করলেন; তারা ছিল সংখ্যায় পঞ্চাশ জন; তিনি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে হুকুম দিয়েছিলেন যে, তারা যেন তাদের কেন্দ্রকে অবলম্বন করে থাকে। কোনভাবেই যেন সেখান থেকে তারা পৃথক না হয়ে যায়, যদিও তারা দেখে যে, মুসলিম সেনাবাহিনীকে পাখীরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ (স) তীরন্দাজ বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন মুশরিকদের উপর তীর নিক্ষেপ করে, যাতে করে তাদের পিছন থেকে তারা মুসলমানদের নিকটে না আসতে পারে।

তিনি যুদ্ধের পতাকা দিয়েছিলেন মুসআব ইবনে উমায়েরকে; আর তার নিজের তরবারী খানা দিয়ে দিলেন আবু দজানাকে; আবু দজানা ছিলেন একজন বীর যোদ্ধা।

দিনের প্রথম প্রহরে কাফিরদের উপর মুসলমানদের বিজয় দেখা দিল। আল্লাহর দুশমনরা পরাজয় বরণ করে পিছন দিকে ফিরে পালিয়ে তাদের মহিলাদের নিকট গিয়ে পৌঁছল।

কিন্তু, হায় আফসোস! তীরন্দাজ বাহিনী রাসূলুল্লাহর নির্দেশ রক্ষা করলেন না। তারা নিজেদের মতে কাজ করে বসলেন। তারা যদি রাসূলুল্লাহর কথা মত নিজেদের অবস্থানকে অবলম্বন করে

থাকতেন তাহলে তাদের জন্য মঙ্গল হতো; কিন্তু তা তারা বুঝতে পারলেন না। তীরন্দাজরা কাফেরদের পরাজয় দেখে তাদের সেই কেন্দ্র ছেড়ে গেলেন যার হেফাজতের নির্দেশ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (স) দিয়েছিলেন। বরং তারা বলতে থাকলেন, ওগো ভাইরা! দেখ দেখ গণীমতের মাল! গণীমতের মাল! দলপতি আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) তাদেরকে রাসূলুল্লাহ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়ে দিলেন, "তোমরা নিজেদের কেন্দ্র অবলম্বন করে থাকবে, সেখান থেকে পৃথক হবেনা যদিও মুসলিম বাহিনীকে পাখীরা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।"

কিন্তু আবদুল্লাহর সাথীরা তাঁর কথা শুনলেন না। বরং তারা ধারণা করলেন মুশরিকরা পরাজিত হয়েছে, তারা আর ফিরে আসবে না। সুতরাং কেন আমরা নিজেদের জায়গায় থেকে যাবো। ঐ দেখ আমাদের ঐ সব সাথী-সঙ্গী গণীমতের মাল নিয়ে নিচ্ছেন; সুতরাং আমরা কেন ছাড়তে যাবো? নিশ্চয় যুদ্ধ শেষ হয়েছে; আর মুশরিকরাও প্রস্থান করেছে। তাদের ফেরার কোন লক্ষণ নেই। সুতরাং এখানে থেকে যাওয়ার কোন মানে হয়না। নিশ্চয় আল্লাহর রাসূল (স) এটা চান নাই, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ এ আদেশ করেন নাই।

তারা চলে গেলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের (রা) গিরিপথ হেফাযতে রাখতে রয়ে গেলেন।

মুশরিকদের অশ্বারোহী বাহিনী আক্রমণ করতে এল, তারা পথ মুক্ত ও নিরাপদ দেখতে পেল; উহা তীরন্দাজ বাহিনী থেকে ফাঁকা পড়ে রয়েছে। ফলে তারা সেখানে প্রবেশ করল, তারা পুনরায় সঙ্গবদ্ধ হল।

আবদুল্লাহ নিহত হলেন, নিহত হলেন তাঁর সাথে থেকে যাওয়া কতিপয় সঙ্গীরা। সাহাবাদের মধ্যে সত্তর জন শহীদ হলেন। আল্লাহ পাক তাদেরকে শাহাদাতের দ্বারা ধন্য করে দিলেন।

আল্লাহর রাসূল (স) এবং তার সাহাবাদের দল দৃঢ় অবস্থান নিলেন। মুশরিকরা রাসূল পাকের (স) নিকট পৌঁছে গেল। তারা তার মুখমণ্ডলে আঘাত করল; আঘাতে হুজুর (স)-এর সামনের দাঁত ভেঙে গেল; তারা তাঁর মস্তকের উপর শিরস্থান খানা ভেঙ্গে দিল তাঁর উপর তারা পাথর নিক্ষেপ করায় তিনি গর্তের মধ্যে পড়ে গেলেন। হযরত আলী ইবনে উবায়দুল্লাহ তাঁকে কোলে উঠিয়ে নিলেন। রাসূলুল্লাহর (স) মুখের ভিতর লোহার টুপির দুটো পেরেক ঢুকে গেল। হযরত আবু উবায়দা কামড় দিয়ে উহা বের করে আনলেন, কিন্তু তার সামনের দুটো দাঁত ভেঙ্গে গেল। আহা! কত বরকতময় দাঁত দুটো! আহা কত কল্যাণময় মূল্যবান দাঁত!

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল পাকের গালের ভিতর লোহার টুপীর একটা পেরেক ঢুকে যায়, আমি নবীজী (স) থেকে তা উঠিয়ে আনতে অগ্রসর হলাম; তখন আবু উবায়দা (রা) বললেন– হে আবু বকর আমি আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে আপনাকে বলছি, আপনি কি আমাকে সুযোগ ছেড়ে দেবেন না? তিনি বলেন–হযরত আবু উবায়দা তাঁর মুখ দিয়ে এবারও তা উঠিয়ে আনলেন; কিন্তু তাতে তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল ।

হযরত আবু বকর (রা) বলেন, আমি চলে গেলাম হুজুরের অন্য আর এক পেরেক উঠিয়ে আনতে। সেবারও আবু উবায়দা (রা) বললেন হে আবু বকর! আমি আপনাকে আল্লাহ পাকের কসম খেয়ে বলছি– আপনি কি আমাকে সুযোগ দেবেন না? তিনি বললেন– হযরত আবু উবায়দা তাঁর মুখ দিয়ে এবারও তা উঠিয়ে আনলেন; কিন্তু তাতে তাঁর সামনের দ্বিতীয় আর একটা দাঁত ভেঙ্গে যায়।

হযরত মালিক বিন সিনান (রা) নবীজীর গালের রক্ত চুষে নেন। তাই তাঁকে বলা হতো ‘চোষক’। তিনি এর জওয়াবে বলতেন– আল্লাহ পাকের কসম– আমি কখনো তাঁকে মুখের থেকে চুষে নেবনা।

মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলের (স) দিকে অগ্রসর হলো; তারা তাঁকে হত্যা করতে চেষ্টা করল; কিন্তু আল্লাহর রহমতে মুমিন-মুসলমানরা তা প্রতিহত করলেন।

নবীজীকে ঘিরে দশজন সাহাবা দাঁড়ালেন, তাঁরা সবাই নিহত হলেন; তাঁদের একজনও বেঁচে থাকলেন না। হযরত আবু দজানা (রা) রাসূল পাকের সামনে পিঠ পেতে ঢাল হয়ে রইলেন। পিঠের উপর তীর পড়তে থাকল; তবুও তিনি নড়াচড়া করলেন না।

তালহা বিন উবায়দুল্লাহ (রা)ও রাসূলে পাকের (স) সামনে হাত পেতে ঢাল স্বরূপ হয়ে থাকলেন। হাত এর উপর তীর পড়তে পড়তে অবশেষে তা অবশ হয়ে গেল।

আহা! কতই না মর্যাদাপূর্ণ এ পিঠ আর এ হাত! রাসূলুল্লাহ (স) পাথরের উপর উঠতে চাইলেন কিন্তু দুর্বলতার দরুণ পারলেন না। হযরত তালহা (রা) তাঁর নিচে বসে পাথরের উপর উঠিয়ে দিলেন।

আহা কতই না ভালো এ পিঠ আর এই আরোহণকারী! উম্মে আম্মরাও (রা) সাংঘাতিক যুদ্ধ করেছিলেন। আমর ইবনে কামিয়াকে তিনি তরবারী দিয়ে অনেকগুলো আঘাত হানলেন; আল্লাহর দুশমনও তরবারী দিয়ে তাঁকে মারাত্মক আঘাত করল।

একবার আল্লাহর রাসূল (স) মাত্র সাতজন আনসার আর দুজন কুরাইশদের মধ্যে অবস্থান করছিলেন। মুশরিকরা সেখানে এসে ভিড় করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ডাক দিয়ে বললেন–কে আছো এমন যে তাদেরকে আমার থেকে হটিয়ে দেবে? আর তার জন্য রয়েছে স্বর্গোদ্যান বেহেশত।

আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তি সামনে চলে এলেন; তিনি লড়াই করতে করতে নিহত হয়ে গেলেন। কাফেররা আবার দলবদ্ধ হয়ে এল; তিনি আবার বললেন–কেউ আছে এমন যে তাদেরকে আমার থেকে হটিয়ে দেবে? তার জন্য রয়েছে জান্নাত; আর

জান্নাতে সে হবে আমার সাথী, বন্ধু! অতঃপর এরূপ চলতে থাকল। অবশেষে সাতজন মুজাহিদের সবাই নিহত হয়ে গেলেন। আনাস বিন নদর (রা) অটল ছিলেন। তিনি বললেন হে আল্লাহ! তাঁরা অর্থাৎ মুসলমানরা যে কাজ করেছে তা থেকে আমি তোমার কাছে ওজর পেশ করছি আর তারা অর্থাৎ মুশরিকরা যা ঘটিয়েছে আমি তা থেকে মুক্ত থাকার ঘোষণা দিচ্ছি। অতঃপর হযরত আনাস (রা) যে সব মুসলমান হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসেছিল তাদের কাছে গিয়ে বললেন–তোমরা কিসের জন্য অপেক্ষা করছো?

তারা বললেন, আল্লাহর রাসূল (স) তো মারা গেছেন। হযরত আনাস (রা) বললেন–তাহলে এরপর এ জীবন নিয়ে তোমরা কী করবে? উঠো তোমরা! মৃত্যুকে বরণ করে নাও সেই কাজের উপর যে কাজের উপর আল্লাহর রাসূল মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর হযরত আনাস (রা) হযরত সা'দ ইবনে মাআযের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, হে সা'দ আমি ওহুদের দিক থেকে বেহেশতের সুগন্ধ পাচ্ছি। হযরত আনাস (রা) বেহেশতের দিকে অগ্রসর হলেন; তিনি তাঁর সম্মুখে তা দেখতে পাচ্ছিলেন। তারপর তিনি তাদের সাথে লড়াই করলেন যারা তাকে আড়াল করে দেওয়ার ইচ্ছা করছিল। হযরত আনাস (রা) কঠোরভাবে যুদ্ধ চালিয়ে গেলেন। অবশেষে তিনি শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁর দেহে তীর, বল্লম ও বর্শার আশিটিরও বেশী আঘাত লেগেছিল। মুসলমানরা তাঁকে রণক্ষেত্রে নিহত অবস্থায় পেয়ে যান। মুশরিকরা তাঁর মরদেহ এমনভাবে বিকৃত করে ফেলেছিল যে, কেউ তাঁকে চিনতে পারে নাই; কেবল মাত্র তাঁর ভগ্নি তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনতে পেরেছিলেন। হে আনাস! আল্লাহ পাক তোমার উপর রহমত নাযিল করুক। মানুষেরা তোমার মত হোক। তারা বীর সাহসী হোক!

বল্লমের আঘাতে সফলতার উচ্চারণ

ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স) একদল সাহাবাকে কিছু লোকের অনুসন্ধানে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা ছিলেন সত্তর জন খাঁটি মুসলমান। এই দাওয়াত অভিযানে হারাম বিন মালহান ছিলেন অন্যতম। তাঁকে জব্বার বিন সালমা নামে জনৈক মুশরিক হত্যা করেছিল। এই হত্যাকারী যে ভবিষ্যতে ইসলাম গ্রহণ করবে তা ছিল চিন্তার অতীত। কিন্তু সেই ব্যক্তি এই হত্যাটি সংঘটিত করার অল্প সময় পর ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তাই লোকে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল; লোকে তার ইসলাম গ্রহণের কারণ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল; সে এর ব্যাখ্যায় বলেছিল আমার ইসলাম গ্রহণের কাহিনী নিম্নরূপ–

আমি হারাম বিন মালহান নামের এক মুসলমানের মুখোমুখি হয়ে পড়ি; আমি তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে বল্লম দিয়ে আঘাত হানি; বল্লমের ফলক যখন তার বক্ষদেশ থেকে বেরিয়ে গেল তখন তাঁকে এ কথা বলতে শুনলাম– **"ফযৃতু ওয়া রব্বিল কা'বাতে"** (কা'বা ঘরের রবের কসম! আমি সফল হয়েছি।)

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম– এর কী অর্থ? আমি কি স্বপ্নের মধ্যে? না এ ব্যক্তি মিথ্যা বলছে? অথচ মানুষ তো মৃত্যুর সময় মিথ্যা বলেনা। অন্য সময়ে মিথ্যা বললেও মৃত্যুর মুহূর্তে সে মিথ্যা বলে না। আর আরববাসীদের এরূপ মিথ্যা বলার কোন অভিজ্ঞতাও নেই। এ ক্ষেত্রে জব্বার বিন সালমার জন্য আশ্চর্যান্বিত এবং অবাক হওয়াটাই যথার্থ ছিল। সে মনে মনে ভাবল একটা

লোককে আমি বল্লম দিয়ে আঘাত হানলাম; বল্লমটা এক দিক থেকে বিদ্ধ হয়ে অন্য দিক থেকে বেরিয়ে গেল, আর সে রক্তাপ্লুত হয়ে ধরাশায়ী হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, তারপরও সে বলছে– **'কাবার রবের কসম! আমি সফল হয়েছি।'**

নিশ্চয় তার বিশ্বাস ছিল, তাঁর স্ত্রী এক্ষুণি বিধবা হয়ে যাবে, তার ছেলে-মেয়েরা ইয়াতিম হয়ে যাবে, দুনিয়ার সকল স্বাদ-আহলাদ থেকে সে চির বঞ্চিত হয়ে যাবে; তার জন্য নাই কোন খাদ্য-পানীয়, নাই চন্দ্রের জোছনা ও সূর্যের আলো, নাই কোন কথা-বার্তা ও নৈশ আলো; কিছুই তার নাই, আছে শুধু মাত্র কবরের গর্ত। তাহলে এটা কিসের সাফল্য?

আমি কোন কোন মুসলমানের কাছে তার এ কথার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করলাম; তারা বলল, তাঁর এ সাফল্য শাহাদাত লাভের জন্য। কেননা তিনি আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস রাখতেন, তিনি জানতেন শহীদ কী সাফল্য লাভ করবেন অর্থাৎ সে সাফল্য পারলৌকিক সুখ, আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের নেয়ামত রাশি। তিনি যেন নিজের দিব্য চোখে তা দেখতে পাচ্ছিলেন। ফলে তিনি বলে উঠেছিলেন–**'কাবার রবের কসম, আমি সাফল্য অর্জন করেছি।"** আমি মনে মনে বললাম আমার জীবনের কসম! হ্যাঁ, তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন।

জাব্বার বিন সালমা জানতে পারল, এ জগতের পরে আছে পরকালের একটা জগৎ; এই সুখ-স্বাদ ও আহলাদ যা সে ভোগ করছে এর পিছনে আছে এমন বহু সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য যা এর থেকে আরো অধিক সুস্বাদু, অধিক প্রাচুর্যময়। সে সুখ-শান্তি আমোদ-আহলাদ কোনদিন নিঃশেষ হবে না। সে জীবন এমন যা কখনো শেষ হবে না; আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন–"ফালা তা'লামু,

নাফ্‌সুম্‌মাউখফিয়া লাহুম মিন কুররাতি আয়ুনিন জাযাআন বিমা কানু ইয়া'মালুন।" কোন মানুষ জানেনা তাদের কৃতকর্মের বিনিময়ে নয়ন জুড়ানো কি জিনিস তাদের জন্য লুকিয়ে রাখা হয়েছে (সূরা সিজদা, ১৭)।

"অলা তাহ্‌সাব্বান্নাল লাযীনা কুতিল্লু ফী-সাবিলিল্লাহি আমওয়াতান বাল্‌ আহয়াউন ইন্দা রাববিহিম ইয়ুরযাকুন। ফারিহীনা বিমা আতাহুমুল্লাহু মিন্‌ ফাদলিহি ।" অর্থাৎ তুমি কখনো মনে করবে না যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়েছে তারা মৃত; বরং তারা চির অমর; তাদের রবের নিকট তারা রিযিক প্রাপ্ত হবে; আল্লাহ তাঁর আপন ফযল ও নেয়ামত থেকে তাদেরকে যা প্রদান করবেন তাতেই তাঁরা আনন্দিত হবে। (সুরা ইমরান, ১৬৯, ১৭০)

এরূপ নিখুঁত ও নিরেট কথা আছে যা কোন মুমিনের হৃদয় থেকে বের হয় এবং যা কোন মুমিনের জিহ্বা থেকে উচ্চারিত হয়; দেখা যায় উহাই ঐ সব কাফিরের ঈমান আনয়নের কারণ হয়ে দাঁড়ায় যারা আল্লাহ, রাসূল এবং পরকালের উপর বিশ্বাস রাখেনা। তেমনি সে নিজের হাতে নিহত ব্যক্তির ধর্মের উপর ঈমান এনে বসে যার ধর্মের সাথে সে এতদিন শক্রতা করে এসেছে এবং লড়াই করে এসেছে।

অনেক নিখুঁত ঈমানদারী কথা এমন প্রভাবশালী হয়ে থাকে যা সৃষ্টি করে অপূর্ব বিস্ময়। পরাজিত করে দেয় অনেক শক্র বাহিনীকে এবং এনে দেয় বহু দেশ ও রাষ্ট্রের বিজয়মালা।

প্রয়াত নবীর নিকট সেনাপতির বার্তা

যখন কোন নিকট আত্মীয় অথবা কোন বন্ধু তোমার নিকট এসে বলে, দেখো আমি স্বদেশে যাচ্ছি, আমি তোমার আব্বার সাথে সাক্ষাৎ করবো, তুমি কি কিছু বলে পাঠাবে? তোমার কি কোন চিঠিপত্র আছে যা তোমার পক্ষ থেকে আমি তাকে পৌঁছে দেব?

তখন তুমি এতে মোটেই সন্দেহ করবে না যে তিনি তোমার আব্বার সাথে একত্রিত হবেন; এবং তোমার আব্বা তোমার ব্যাপারে ভালো সংবাদ এবং তোমার স্বাস্থ্যের কুশল-বার্তা জানতে চাইবেন। ফলে তুমি সেই লোককে বলে থাকো যে, আপনি আমার আব্বার কাছে আমার পক্ষ থেকে ছালাম জানাবেন, আর তাকে বলবেন যে আপনার ছেলে ভাল আছে, আর আপনাদের দোয়ায় সুস্বাস্থ্য ও আনন্দের মধ্যে আছে।

ঠিক তদ্রুপ মুসলমানেরা এই বিশ্বাস করে থাকে যে, মরণ হল পরকালে যাওয়ার পথে একটা মাধ্যম বিশেষ। মুসলমানদের মধ্যে প্রতিটি লোক যিনি এই স্তর পার হবেন তিনি আখেরাত বা পরকালে পৌঁছে যাবেন; তিনি সেখানে আল্লাহ পাকের রাসূলের (স) সাথে মিলিত হবেন এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবেন; এবং এটা সুনিশ্চিত যে, রাসূলুল্লাহ তাঁর আপন উম্মত সম্পর্কে জানতে চান।

আবার এটাও সম্ভাবনা থাকে যে, আপনার সেই নিকট আত্মীয় কিংবা বন্ধু কোন বাধা বা দুর্ঘটনার কারণে দেশে নাও পৌছতে পারেন; কিংবা দেশে পৌছলেও আপনার আব্বার সাথে মিলিত হতে নাও পারেন।

কিন্তু মুসলমানেরা কখনো মৃত ব্যক্তির পরকালে পাড়ি দেওয়ার এবং রাসূলের সাথে শহীদদের সাক্ষাতের ব্যাপারে কোন প্রকারের সন্দেহ পোষণ করে না। মুসলিম বাহিনী কুজ-কাওয়াজ করে সিরিয়ার পথে রওনা দিয়েছে, আর নবীজী (স) তাদেরকে জানিয়ে দিলেন, তোমরা পারস্য ও রোম সম্রাটদের ভাণ্ডার অবশ্যই জয় করে নেবে; আল্লাহ পাক তোমাদের পক্ষে সাহায্য দানের অঙ্গীকার করেছেন। তিনি বলেছেন "নিশ্চয় তারা বিজয় প্রাপ্ত হবে; নিশ্চয় আমাদের বাহিনী বিজয়ী হবে।" (সাফফাত ১৭২/১৭৩)।

আল্লাহর সাহায্য এবং যুদ্ধ বিজয়ের ব্যাপারে মুসলমানরা ছিল আস্থাশীল। আর বাস্তবে এইরূপই ছিল। মুসলমানেরা শহরের পর শহর জয় করে নিয়েছিল; এবং বাহিনীর পর বাহিনীকে পরাজিত করে চলছিল।

এক ব্যক্তি ইয়ারমুকের দিন মুসলিম সেনাপতি আবু উবাইদার (রা) নিকট এসে বললেন, দেখুন আমি নিশ্চয়ই নিজের ব্যাপারে (অর্থাৎ শাহাদাত লাভের ব্যাপারে) প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছি; রাসূলুল্লাহর (স) কাছে আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি?

হযরত আবু উবায়দা (রা) বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই আছে। তুমি আমার পক্ষ থেকে তাঁকে আমার ছালাম জানাবে আর বলবে, হে আল্লাহর রাসূল (স)! আমাদের রব যে অঙ্গীকার আমাদের সাথে করেছেন তা আমরা সত্য সত্যই লাভ করেছি। (*বেদায়া ওয়া নেহায়া*, ৭/১২)

কৃচ্ছ্রতায় সঞ্চিত দিরহামগুলোও গেল

সাইয়্যেদেনা হযরত আবু বকর (রা) ছিলেন মুসলমানদের খলীফা। তিনি আরব উপদ্বীপভুক্ত এমন এক বিশাল বিস্তৃত রাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন যা যুদ্ধ ও বিজয়ের মাধ্যমে সিরিয়া রাজ্যের দূরদূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল।

তিনি রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে ভাতা গ্রহণ করতেন যা দিয়ে তাঁর এবং তার ছোট পরিবারের খরচ মোটামুটি চলত। অথচ খেলাফতের দায়িত্ব লাভের আগে তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। খেলাফতের দায়িত্ব তাঁকে ব্যবসা থেকে বিরত রাখে। ফলে তিনি রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে নিজের ও নিজের পরিবারের জন্য সংকুলান মত ভাতা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। কেননা তিনি জীবিকা উপার্জনের কোন সময় সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আর তাই মুসলমানদের স্বার্থে এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং খেলাফতের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সাথে জড়িত হওয়ার জন্য তা করতে হয়েছিল।

তিনি রাষ্ট্রীয় ধনাগার হতে নিজের এবং নিজের পরিবার ও পরিজনদের চলার জন্য সংকুলান যোগ্য খাদ্য রুটি এবং তরকারী গ্রহণ করতেন।

তবে শহরবাসী ধনী পরিবারের মধ্যে আল্লাহ যাদের জীবিকার প্রাচুর্য দিয়ে থাকেন তাদের মত তিনি পানাহারের প্রশস্ততা এবং রকমারি ব্যবস্থা করতে পারতেন না। অথচ তিনি যখন পরিবারের নেতা হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন তখন তার পরিবারের অবস্থা ছিল সুন্দর ও স্বচ্ছল।

খলীফা আবু বকরের (রা) ছোট ছোট সন্তান-সন্ততি ছিল যারা জীবন বাঁচানো যায় এ পরিমাণ খাদ্যের উপর নির্ভর করে চলত; তারা আকাঙ্ক্ষা মিটানোর মত কোন মিষ্টি-মিঠাই এবং ফলফলারি পেতনা, যেমন মদীনার ধনী ও স্বচ্ছল পরিবারে তাদের সমবয়সী ছেলে মেয়েরা পেত। তাদের জন্য অতিরিক্ত খাবারের আর কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাদের মমতাময়ী মা এটি অনুভব করলেন, তাই তাঁর ইচ্ছা হল ছোট ছেলেমেয়েদের মুখে তিনি একদিন মিষ্টি উঠিয়ে দেবেন, হালুয়া দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করবেন।

সুতরাং তিনি মহামতি স্বামীকে এ ব্যাপারে তার জন্য একটা দিন ধার্য করা এবং বায়তুল মাল থেকে ভাতার অংক বাড়ানোর মিনতি করলেন।

খলীফা হযরত আবু বকর (রা) বললেন, বায়তুল মাল মুসলমানদের আর তাদের মধ্যে আছে বহু গরীব ও অভাবী লোক। তিনি নিজের আগ্রহ আকাঙ্ক্ষা মেটাতে এবং খাদ্য-পানীয়ের রকমারি ব্যবস্থা করতে সক্ষম হবেন না।

স্ত্রী বললেন– তাহলে যদি আমাদের কয়েক দিনের খরচ থেকে কিছু কিছু জমা করে রাখি, আর তাতে যে অংশটা থেকে যাবে তা দিয়ে কি হালুয়া কিনতে কোন বাধা থাকবে?

খলীফা বললেন– না; তাতে কোন বাধা নেই। এটি তোমার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল হবে। খলীফা আবু বকরের (রা) স্ত্রী কয়েকদিনের খরচ থেকে কিছু কিছু বাঁচিয়ে রাখলেন যা হালুয়া কেনার উপযোগী হয়ে গেল। অতঃপর তিনি কয়েকটি দিরহাম খলীফা আবু বকরের (রা) সামনে পেশ করলেন, আর বললেন এই

নিন কয়েকটি দিরহাম; এর বিনিময়ে আপনি আমাদের জন্য কিছু হালুয়া কিনতে পারবেন।

কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীকের (রা) মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের কাছে ইহা টিকলনা; তিনি বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় ধনাগারে তা ফিরিয়ে দিলেন। এবং বায়তুল মালের দায়িত্বশীলকে বলে দিলেন, আমার এখন এটাই যথার্থ বলে মনে হচ্ছে যে, আমার পরিবার বায়তুল মাল হতে বরাদ্দকৃত ও প্রদেয় দেরহামের কমেও সংসার চালাতে এবং সদস্যবর্গের অন্ন সংস্থান করতে সক্ষম। সুতরাং প্রতিদিনের খরচ বাবদ এই পরিমাণ দিরহাম আমাদের ভাতা থেকে হ্রাস করে দেবেন। কেননা এতটুকু কম হলেও আমাদের সংসার চলে । আর যেহেতু মুসলমানদের বায়তুল মাল এমন কিছু নয় যে, খলীফার পরিবার তা দিয়ে খানাপিনায় অমিতাচার হয়ে পড়বে। এমনটাই হল; সুতরাং প্রতিদিনের ভাতা হতে এই পরিমাণ দিরহাম

হ্রাস পেল। আর ইহা এমন এক সৎ-পুণ্যবান পরিবারের অংশ থেকে হ্রাস করা হয়েছিল যার মালিক্ এক বিশাল রাষ্ট্র শাসন করতেন। যার কাছে বহু এলাকা থেকে প্রচুর যুদ্ধলব্ধ মাল এবং সম্পদ চলে আসতো।

এহেন একটি পরিবার চাহিদা মাফিক হালুয়ার স্বাদ ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলনা। তারা প্রতিদিন বায়তুল মাল হতে প্রাপ্ত সর্ব নিম্ন ভাতার দ্বারা তুষ্ট থাকতে বাধ্য হলেন।

হযরত সিদ্দীকে আকবরের স্ত্রী বেগম সাহেবাও তাঁর মহান স্বামীর কৃত কর্মে রাজী হয়ে গেলেন এবং তিনি কোন প্রকার ক্ষতি এবং অর্থদণ্ড বলে মনে করলেন না। মহামহিম আল্লাহ তায়ালা এভাবে সত্যায়ন করেছেন "আতৈয়েবাতু লিত-তৈয়েবীন ওয়াত্ তৈয়েবুনা লিত তৈয়েবাত্" সচ্চরিত্রা নারীকুল সচ্চরিত্র পুরুষকুলের জন্য এবং সচ্চরিত্র পুরুষকুল সচ্চরিত্রা নারীকুলের জন্য। (সুরা নূর, ২৬)

সাইয়্যেদানা আবু বকর (রা) মুসলমানদের মধ্যে যারা দায়িত্বশীল যারা রাজা-বাদশাহ, প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী, প্রশাসক তাদের জন্য এক উদাহরণ রচনা করে গেছেন। তিনি সংসার জীবনে কৃচ্ছ্রতা ও অল্পতুষ্টিকে পানাহারে এবং জীবনের সকল চাহিদা পূরণের উপর প্রাধান্য দিতেন; তিনি আখেরাতকে দুনিয়ার উপর গুরুত্ব দান করতেন। আল্লাহ তো বলেছেন **"ওয়া মা ইন্দাল্লাহি খায়রুন ওয়া আবকা, আফালাতা'কিলুন?"**. আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তাই হল সর্বোত্তম এবং চিরস্থায়ী। (সুরা কাসাস, ৬০) আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট থাকুক হযরত আবু বকর এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের উপর।

সাদাসিধে পোষাকেও হযরত ওমরের সম্মান

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাবের (রা) খেলাফত কালে সিরিয়া রাজ্যের বিজয়ধারা চলতে থাকল; অবশেষে ইহা বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত পৌঁছে গেল। যেখানে রয়েছে পবিত্র মাসজিদুল আকসা। সেখানকার খৃষ্টানরা যারা সিরিয়া ও রোমীয় রাজ্যে শাসন চালাত তারা দাবী করল মুসলমানদের খলীফা নিজেই এখানে আসবেন আর সন্ধিচুক্তি নিজ হাতে লিখে দেবেন। তাহলে তারা পবিত্র মাসজিদে আকসার চাবিগুলো তাঁর কাছে সোপর্দ করবেন। কেননা বিষয়টা ততো সহজ ও হালকা নয়। আর বায়তুল মুকাদ্দাস অন্যান্য শহর ও দেশের মত নয়; বরং এর রয়েছে এমন এক মর্যাদা যা অন্য দেশের নেই। একে তৈরী করেছিলেন আল্লাহর নবী হযরত সুলায়মান (আঃ)। এই মাসজিদের মধ্যে তাঁর পরবর্তীকালে সকল আম্বিয়া কেরাম সালাত আদায় করেছিলেন। সুতরাং আত্মসমর্পণ যদি অত্যাবশ্যকই হয় তাহলে খলীফার কাছেই আত্মসমর্পণ করাই হবে বুদ্ধিমত্তার কাজ।

মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি সাইয়্যেদেনা আবু উবায়দা (রা) এ ব্যাপারে আমীরুল মুমেনিনের নিকট লিখে পাঠালেন; এবং বললেন–বায়তুল মুকাদ্দাসের বিজয় তাঁর আগমনের উপরই নির্ভরশীল। হযরত ওমর (রা) সাহাবা কেরামের সাথে পরামর্শ করলেন। যেহেতু খলীফা বিরাট বিরাট ব্যাপারে জড়িত। কোন কোন সাহাবা তাঁর সফরের ব্যাপারে মৌনতা অবলম্বন করলেন এবং

খৃষ্টানদের অহংকারকে ঘৃণা জানিয়ে নেতিবাচক ইংগিত প্রদর্শন করলেন।

কিন্তু হযরত আলী (রা) তাঁকে বায়তুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন; কেননা এর মধ্যে মুসলমানদের গৌরব সৌভাগ্য এবং সুবিধা নিহিত রয়েছে। হযরত ওমর (রা) এই মত গ্রহণ করলেন এবং সফরের জন্য প্রস্তুতি নিলেন। অতঃপর তিনি হযরত আলীর (রা) উপর মদীনার প্রতিনিধিত্ব প্রদান করে সিরিয়া অভিমুখে রওনা দিলেন।

আমীরুল মুমেনীর্ন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) এমন এক ব্যক্তি যাঁর প্রতি রোম ও পারস্যের সম্রাটগণ আতংকগ্রস্ত থাকতো; যার নাম শুনে অন্তরাত্মা হয়ে উঠত ভীতিপূর্ণ। শংকায় কানগুলো হত উৎকণ্ঠিত। অথচ তিনি যখন তাঁর শাসন কর্তৃত্বের মধ্যে নিজ রাজ্য ভ্রমণ করতেন তখন চলা ফেরায় থাকতেন একজন সাধারণ মানুষের মত এবং শাসন পরিচালনায় থাকতেন খুব সাদাসিধে।

দীর্ঘকাল ধরে অন্যান্য জাতির শাসনামলে রাষ্ট্র এমন ছিল যেখানে বিজয়ী শাসকের দর্শনে, তার শোভাযাত্রার সংবাদে এবং সম্মান সম্বর্ধনার মিছিলে মানুষের চোখগুলো ব্যাকুল বিহ্বল হয়ে উঠত।

ইতিহাসে জীবন চরিত গ্রন্থসমূহের বিশাল জায়গা জুড়ে রয়েছে ঐ সব রাজা-বাদশাহদের সফরসমূহের সংবাদ রাশি। মানুষ তা বর্ণনা করে আর তাদের অন্তরগুলো ভরে উঠে তাদের বড়াই এবং অহংকারে। কিন্তু এখানে বিষয়টি হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। আর যা ইতিহাসে বারবার আলোচিত বহু অভিজ্ঞতার বিপরীত। এবার হযরত ওমরের (রা) ভ্রমণ কাহিনীটি শোনা যাক।

হযরত ওমর (রা) সিরিয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এমন এক উটে চড়ে যার রং ধূসর বর্ণের; রৌদ্রে তাঁর মাথার উপরিভাগ চিকচিক করছে। বাহনটির হাওদার দু'ধারে রেকাববিহীন অবস্থায় তাঁর দুখানা পা ঝুলছে। পশমী কম্বল হল এর ফরাস; এটাই হল তার রেকাব যখন তিনি চড়ে বসেন; আবার এটাই হয় তার ফরাস যখন তিনি নেমে বসেন।

তার থলেটা হল খেজুরের পাতা দিয়ে অথবা ছোবড়ার পাড়ওয়ালা চাদর দিয়ে তৈরী। এটাই হল তার থলে যখন তিনি বাহনের পিঠে চড়ে বসেন, আবার এটাই হয় তার বালিশ যখন তিনি নিচে নেমে বসেন। তাঁর দেহের উপর জড়ানো পুরো থান কাপড়ের জামা– তা ছাপ মারা আর ছেঁড়া পাড়ওয়ালা; তাঁর কাছে দ্বিতীয় কোন জামা নাই।

তিনি বললেন–তোমরা সমাজপতিকে আমার কাছে ডেকে আনো। তারা তাঁর কাছে তাকে ডেকে আনলো। অতঃপর তিনি বললেন– আমার জামাটা ধুয়ে দাও আর ওটাকে সেলাই করে দাও। তোমরা (এই ফাঁকে) আমাকে একখানা কাপড় অথবা জামা ধার দাও। একটি কাতানের (নীল মিহি সুতার) জামা আনা হল; তিনি বললেন– এটা কী কাপড়? তারা বলল– কাতানের। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন– কাতান কী জিনিস? লোকেরা তাকে এ সম্পর্কে বলে দিল। তিনি তার জামা খুলে ফেললেন; অতঃপর উহা ধুয়ে এবং সেলাই করে তাঁর নিকট আনা হল, তিনি তাঁর (ধার করা) জামাটা খুলে ফেললেন এবং নিজের জামাটা পরে নিলেন।

খ্রিষ্টান দলপতি তাঁকে বললেন–আপনি আরবের সম্রাট; এ এমন এক দেশ যেখানে উটে চড়ার জন্য উপযুক্ত নয়; আপনি যদি

এ ছাড়া অন্য পোষাক পরতেন এবং একটা তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করতেন তাহলে রোমবাসীদের দৃষ্টিতে এটা সম্মানজনক হতো।

হযরত ওমর (রা) বললেন, আমরা বিশেষ এক জাতি, আল্লাহ আমাদেরকে ইসলামের দ্বারা ইজ্জত প্রদান করেছেন; সুতরাং আমরা আল্লাহ ছাড়া বিক[illegible] কিছুই চাইব না। এই ছিল হযরত ওমরের (রা) মহত্ত্ব ও মর্যাদা। তিনি ছিলেন মুমিনদের নেতা, মুসলিম জাতির খলীফা, তিনি ছিলেন এমন ব্যক্তি যার নাম শুনে বড় বড় রাজা-বাদশাহদের ঘুম উধাও হয়ে যেতো। যার বিজয়ের ধ্বনিতে দিগদিগন্ত ভরে উঠতো। মদীনা থেকে আল কুদস পর্যন্ত তাঁর ভ্রমণযাত্রা ছিল এরূপ। এই অবস্থায় বহু শহর বন্দর অতিক্রম করে তিনি মদীনায় পৌঁছে যান। অপলক নয়নে মানুষ তাঁর দিকে তাকাতো আর চোখ জুড়াত।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন–“লিল্লাহিল ইজ্জাতু ওয়ালিরাসূলিহি ওয়া লিল্‌মুমিনীনা ওয়লাকিন্নাল মুনাফিকীনা লা ইয়া‘লামুন”–আর সম্মান হল আল্লাহ পাকের, তদীয় রাসূলের এবং সকল মুমিনের; কিন্তু কপট লোকেরা তা জানেনা। (সুরা মুনাফিক, ৮)
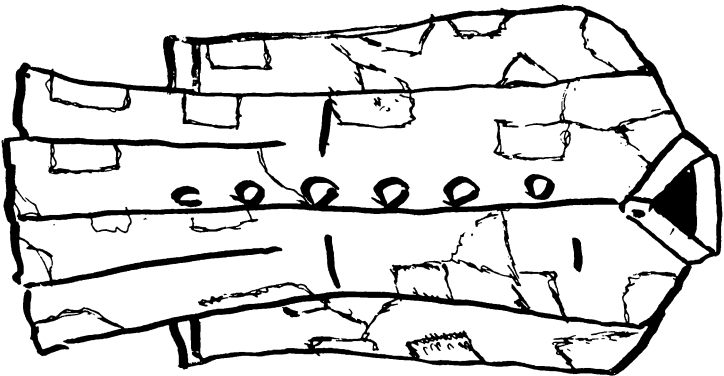
মানবেতর প্রাণী সেবার অভাবিত পুরস্কার

নিশ্চয়ই আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি ভাল কাজের মূল্যায়ন করে থাকেন; এতে তিনি মুগ্ধ হয়ে উহার নায়ককে ধন্যবাদ জানান। যিনি দানশীলতা, সমাজ সেবা, দুর্দশাগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সহায়তা করেন তাকে প্রশংসা করেন; এবং তার অনুগ্রহ ও দানের স্বীকৃতি দেন আর বলেন– আপনি মহৎ ও ভালো কাজ করেছেন; আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুক।

কিন্তু এসব কাজকর্ম মানুষের স্তরভেদে এবং মনোবলের পরিমাণ অনুযায়ী সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর কর্মের প্রতি যে ভালোবাসা আল্লাহ তায়ালা স্বভাবসিদ্ধ করে দেন- উহার পরিমাপ, যথাযথ মূল্যায়ন, অর্থ-সম্পদের প্রতি তুচ্ছ মনোভাব, আল্লাহর পথে উৎসর্গ করা এবং পূর্ণ বিনিময় প্রদানের ভিত্তিতে উহা সম্পাদিত হয়ে থাকে। কবি সত্যই বলেছেন–"তাতী আলা কাদরিল ফিরামে আল্ মাকারিমু"–মহৎকর্ম ব্যক্তির মহত্তের পরিমাপ অনুযায়ী প্রকাশ পেয়ে থাকে।

তোমরা প্রত্যেকেই নবী কন্যা হযরত ফাতিমা (রা) এবং আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবু তালেবের (রা) সন্তান হযরত হাসানকে (রা) জানো; তিনি দৈহিক গঠন এবং চরিত্রের দিক দিয়ে রাসূল পাকের (স) সমতুল্য ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ বলেছেন–"ইন্না ইবনী হাযা সাইয়্যেদু"–আমার এই ছেলে অবশ্যই একজন সাইয়্যেদ।

তোমাদের কাছে একটি কথিকা পেশ করছি যা তাঁর উচ্চ মনোবল ও সৎকর্মের যথাযথ মূল্যায়ন এবং এর পরিপূর্ণ পুরস্কার প্রদান করার প্রমাণ বহন করে।

হযরত হাসান (রা) মদীনার কোন এক বাগানের ভিতর দিয়ে পথ অতিক্রম করতে ছিলেন; তিনি দেখতে পেলেন কৃষ্ণকায় এক ক্রীতদাস। তার হাতে একখানা রুটি; সে এক লোকমা নিজে খাচ্ছিল এবং অন্য এক লোকমা একটি কুকুরকে খাওয়াচ্ছিল, এভাবে রুটির অর্ধেক ভাগ করে কুকুরকে দিয়ে দিল।

এটি ছিল এক অদ্ভুত এবং অপ্রচলিত জিনিস। কেননা অধিকাংশ মানুষ (একাকী খাদ্য) গ্রহণ করে নিজকে প্রাধান্য দেয়। সম্ভবত খাদ্যটুকু উক্ত কৃষ্ণ দাসটির একদিনের আহার্য ছিল, সে এ ছাড়া আর কিছু পায় নাই। কিন্তু রুটিখানা তার একান্তভাবে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও সে কুকুরটিকে ভাগ করে দিয়েছিল। আর ওটা অবশ্যই কুকুরটার জন্য স্থিরকৃত পাওনা খাদ্য থেকে বাড়তি ছিল; কারণ কুকুর সাধারণত বাগানে কিংবা মালিকের দস্তরখানের খাদ্যাংশ থেকে তৃপ্তি মেটানো খাদ্য পেয়ে থাকে।

দৃশ্যটা এমন অদ্ভুত ও অপূর্ব ছিল যা হযরত হাসানের (রা) দ্রুত মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁকে থমকে দিয়েছিল। এমনকি তাঁকে কৃষ্ণ দাসটির প্রতি প্রশ্ন করতে বাধ্য করেছিল, "কি জিনিস তোমাকে অর্ধেক ভাগ করে কুকুরটিকে দিতে এবং ওকে সামান্য কম করে না দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে ?

এটা তো বুঝাই যাচ্ছে যে, দাসটি কুকুরের কোন পাহারাদার ছিল না; এবং তার কাছে অভিযোগ করার মত কোন ভাষা কুকুরের ছিল না। আর দাসটির কাছে তা না ছিল কোন পাওনা, আর না ছিল তার চাওয়া-পাওয়ার কোন অধিকার।

প্রশ্নের উত্তর ছিল–**"দেখুন! তার দুটো চোখের ভাষা থেকে আমার দুটো চোখ ওকে কম দিতে লজ্জাবোধ করছিল**। এ দৃশ্য আর এ অদ্ভুত উত্তর হযরত হাসান (রা)-এর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে; তাঁর অন্তরের মধ্যে বিরাট আকারের মহানুভবতার প্রভাব পড়ে। আর এই মহৎ চরিত্র তিনি তাঁর সেই মাতামহ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ

করেছিলেন যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, **“ইন্নাকা লা আলা খুলুকিন্ আযীম”** আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।

অতঃপর তিনি কৃষ্ণ দাসটিকে বললেন, ‘তুমি কার দাস?’ দাসটি বলল, আমি আবান ইবনে উসমানের দাস। অতঃপর হযরত হাসান (রা) তাকে বললেন– “আর এ বাগানটা কার?” দাসটি বলল, “আবান ইবনে উসমানের।” হযরত হাসান (রা) তাকে বললেন, আমি তোমার কাছে কসম খাচ্ছি– আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি নড়বে না। অতঃপর হযরত হাসান (রা) চলে গেলেন; এবং সেই দাস আর সেই বাগান কিনে নিলেন।

আমরা সকলে এটা অনুমান করতে পারি যে, ঐ দাস আর ঐ বাগানটা কেনার জন্য হযরত হাসান (রা) কি পরিমাণ অর্থ খরচ করেছিলেন। আর ঐ অতি মূল্যবান সম্পদের মূল্য পরিশোধের কাজটা তাঁকে কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছিল। তিনি দাসের নিকট চলে আসলেন এবং তাকে বললেন, 'আমি অবশ্যই তোমাকে ক্রয় করেছি।'

দাসটি উঠে দাঁড়াল এবং বলল– ‘হে আমার প্রভু! এখন আল্লাহ, তদীয় রাসূল এবং আপনার জন্য আমার আনুগত্য ও কথাশুনা অনিবার্য হয়ে গেল। হযরত হাসান (রা) আবার বললেন, বাগানটাও আমি কিনে নিয়েছি। তবে এখন তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে স্বাধীন হয়ে গেলে; আর বাগানটাও আমার পক্ষ থেকে তোমাকে উৎসর্গ করলাম।

দাসের অবাক ও বিস্মিত হওয়ার প্রশ্ন তুমি নাই বা করলে! কি আনন্দ আর কি খুশীতে সে ডুবে গেল তা নিয়ে তুমি নাইবা ভাবলে! কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে সে স্বাধীন হয়ে ঐ মূল্যবান ও বিশাল বাগানের মালিক বনে গেল–এতো আল্লাহরই দেয়া পুরস্কার, তার ঐকান্তিতার প্রাপ্তি!

এক মহান শাসকের রাজ্য শাসন

ওমর ইবনে আবদুল আযীয ছিলেন একজন ন্যায়পরায়ণ উমাইয়া খলীফা। তিনি ছিলেন সমকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শাসক। তিনি আরব উপদ্বীপ, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকা, পারস্য ও খোরাসান শাসন করতেন; তাঁর রাজ্য ভারত সীমানা পর্যন্ত এসে পৌঁছেছিল। তিনি খলীফা পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ এবং জায়গা-জমি রাষ্ট্রীয় ধনাগারে ফিরিয়ে দেন; তাঁর স্ত্রীর অলংকারগুলো রাষ্ট্রীয় ধনাগারে জমা দেন। তাঁর জীবন জীবিকায় দুনিয়া বিরাগ এবং কৃচ্ছ্র সাধনা এমন স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে অতি সংসার বিমুখ ব্যক্তিও পৌঁছতে অক্ষম ছিল, রাজা-বাদশা ও আমীর-ওমরা তো দূরের কথা।

কোন কোন সময় জামা কাপড় শুকানোর জন্য অপেক্ষা করতে করতে জুমার নামাজে পৌঁছতে দেরী করে ফেলতেন। তার দৈনিক ভাতা দু দিরহামের বেশী ছিল না।

যখন কেউ তার সাথে ব্যক্তিগত ব্যাপারে আলোচনায় বসতেন তখন তিনি বায়তুল মালের তেলে জ্বালানো প্রদীপ নিভিয়ে দিতেন; ফলে এক ব্যক্তি তাকে প্রশ্ন করে বসলেন হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এবং আপনার পরিবারবর্গ কি ধরনের লোক যারা সরকারী প্রদীপ নিভিয়ে নিজ মালিকানার প্রদীপ চেয়ে পাঠায় কিংবা অন্ধকারে তার সঙ্গী-সাথীদের সওয়ালের জওয়াব দেয়?

একবার তিনি নিজ পরিবারের লোকদেরকে দেখতে এবং ছালাম জানাতে বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লেন। তিনি লক্ষ্য করলেন

যখন তাঁর প্রতিটি মেয়ে তাঁর মুখোমুখি হলো এবং তিনি তাদের সাথে কথা বলতে থাকলেন তখন প্রত্যেকে নিজের মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কথা বলছে। তিনি এ অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। তখন তারা ওজর জানিয়ে বলল, আজ তারা বাড়ীতে ডাল আর (কাঁচা) পেঁয়াজ ছাড়া খাওয়ার আর কিছুই পায় নাই। তাই প্রত্যেকের ভয় হচ্ছিল, এর দুর্গন্ধ তাঁর কাছে পৌঁছে যায় কিনা? তিনি শুনে কেঁদে ফেললেন; এবং বললেন, শুনো আমার মেয়েরা! নানা রকমের সুখের জীবন অতিবাহিত করে তোমাদের বাপের সাথে দোজখের পথে চলে তোমাদের কি উপকার করবে? এ কথা শুনে মেয়েরা চুপ হয়ে গেল; এবং এই সাদাসিধে এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনে রাজী হয়ে গেল। অথচ সে সময়ও অন্য সকল সরকারী কর্মচারী এবং দেশের অধিকাংশ অধিবাসী সুস্বাদু খাদ্য, মূল্যবান-মনোরম পোষাক এবং বিলাসী স্বচ্ছল জীবন উপভোগ করতো।

তাঁর এই পরহেজগারী এবং সাধুপরায়ণতা কেবল তাঁর ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর দেশের সাধারণ প্রশাসনিক, রাজনীতির ধারাও এরূপ ছিল।

তিনি চাইতেন তাঁর রাষ্ট্রের নির্বাহী কর্মকর্তাগণ এবং কর্মচারীরাও সাধুপরায়ণ হয়ে যাক; নিজেদের ব্যাপারে কৃচ্ছ্রতা অবলম্বন করে অন্য মুসলিমদের উপর উদার দানশীল হয়ে যাক।

তিনি বিশ্বাস করতেন, টাকা-পয়সা রক্ত সমুতুল্য। সুতরাং শিরা, উপ-শিরার বাইরে এর প্রবাহ বৈধ নয়। তিনি এ মত পোষণ করতেন না যে, মানুষের সদ্‌গুণাবলী ও আচার-আচরণের অবকাঠামোগুলো নষ্ট হয়ে যাক।

এক রাজকর্মচারী খলীফার কাছে এই বলে কিছু কাগজ চেয়ে পাঠালো যে, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে উহাতে কিছু লিখে রাখতে হবে। তিনি এর জওয়াব পাঠালেন, যখন তোমার কাছে আমার এই জওয়াবী চিঠি পৌঁছে যাবে তখন তুমি কলমের আগাটা সরু করে নিবে এবং লেখাগুলো ঘন করে লিখবে। আর বেশী প্রয়োজনীয় কথাগুলো এক পৃষ্ঠার মধ্যে একত্রিত করে রাখবে। কেননা মুসলমানদের বায়তুল মালের ক্ষতি সাধনকারী বাহুল্য কথা লেখার মধ্যে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

ইতি

আসসালামু আলামকুম

জনৈক রাজকর্মচারী তাঁর কাছে অভিযোগ জানালো যে, মুসলমানদের কাছ থেকে জিজিয়া কর রহিত হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয় ধনাগারে রাজস্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। কেননা মুসলমানদের উপর জিজিয়া কর নাই।

খলীফা জওয়াব লিখে পাঠালেন, নিশ্চয় মহামহিম আল্লাহ পাক নবী মুহম্মদকে (স) পাঠিয়েছিলেন মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিতে; তাঁকে তো তিনি খাজনা আদায় করতে পাঠান নাই। (সিরাতে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয, ইবনে আব্দুল হাকীম)।

পরিচয় গোপন রাখার মাহাত্ম্য

আল্লাহ আমাদের এবং সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুক; নিশ্চয় আমাদের মধ্যে প্রতিটি লোক যখন কোন প্রশংসনীয় কিংবা দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণীয় কোন কাজ সম্পাদন করে এবং অনেকের মধ্যে বিস্ময় ও বড়াই জাগ্রত করে তোলে তখন সে পরিচিত ও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে; এবং নিজের নাম প্রচার করতে এবং স্মরণীয় হতে চায়, আর এটা হল মানবীয় স্বভাব। এজন্য কাউকে তিরস্কার করা যায় না।

কিন্তু যে সব মুসলমান নবীজীর শিক্ষালয় থেকে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং ইসলামী প্রশিক্ষণ অঙ্গনের ছত্র-ছায়ায় লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাদের ব্যাপারই ছিল এ থেকে ভিন্ন ধরনের। তাঁদের মধ্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রকাশ হয়েছে অপূর্ব একনিষ্ঠতা; প্রকাশ পেয়েছে অহমিকা, খ্যাতি-প্রীতি এবং প্রশংসা, লালসা থেকে দূরে অবস্থান করার অদ্ভুত ঘটনাবলী। যা ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের হতবুদ্ধিতার ক্ষেত্রকে নিঃশেষ করতে পারছে না।

প্রিয় পাঠকের কাছে সেই সব অজস্র বিরাট বিরাট কাহিনীর মধ্য থেকে একটি ছোট কথিকা তুলে ধরা হলো। মুসলমানেরা পারস্যের সাসানীয় রাষ্ট্রের রাজধানী মাদায়েনে উপস্থিত হল। তারা রাজ্যের পর রাজ্য জয় করতে থাকল, যুদ্ধলব্ধ সম্পদরাশি লাভ করতে থাকল; আর সে যুগে যুদ্ধলব্ধ মাল-মাত্তাই ছিল শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আরবরা ছিল উটের রাখাল, তারা ছিল পশুর পশমের তৈরী ঘর-গৃহের অধিবাসী।

এক ব্যক্তি হাতির হাড়ের তৈরী একটা বক্স নিয়ে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি ও নেতার দিকে অগ্রসর হল; এবং তার কাছে সেটা দিয়ে দিল। সেনাপতির নিকট ছিল বহু লোকজন; এই দুঃস্থ আরবীয় লোকটি এহেন বহুমূল্যের উত্তম দ্রব্য বহন করে নিয়ে আসায় তারা আশ্চর্যান্বিত হল।

তারা বলতে লাগল আমরা এ রকম জিনিস কখনো দেখি নাই। আমাদের কাছে যা আছে তা এর সমতুল্য হবে না; কিংবা এর কাছাকাছিও হতে পারবে না।

তারা তাকে বললো–'তুমি কি এ থেকে কিছু নিয়ে রেখেছো?' আগন্তুক বললো, 'আল্লাহর শপথ। যদি তাই হতো তাহলে আমি আপনাদের কাছে এটা নিয়েই আসতাম না।' তখন তারা বুঝতে পারল, নিশ্চয় লোকটার মধ্যে এক বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে।

তারা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কে? আপনার পরিচয় কী? লোকটি বলল, 'না, আল্লাহর কসম, আপনাদের কাছে আমার পরিচয় জানাবো না; যাতে আপনারা আমার প্রশংসা না করতে পারেন; অথবা আপনাদের ছাড়া অন্যরাও যেন আমার সুখ্যাতি না গেয়ে বেড়ায়। তবে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি; এবং তার পুরস্কারে সন্তুষ্ট আছি।

তারা লোকটার পিছু নেওয়ার জন্য একজন লোক ঠিক করল। অবশেষে লোকটি তার আপন সঙ্গীদের নিকট পৌঁছে গেল। লোকটি তার সম্পর্কে জনগণের কাছে জিজ্ঞাসা করল; জানা গেল তিনি আমের বিন আবদুল কয়েস।

মহান আল্লাহ সত্যই বলেছেন–"ইন তুবদু শাইয়ান আউতুখফুহু ফাইন্নাল্লাহা বিকুল্লি শাইয়িন আলীমা"–তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর কিংবা গোপন কর (তাতে কিছু আসে যায় না) নিশ্চয় আল্লাহ সব কিছুই জানেন। (সুরা আহজাব, ৫৪)।

মহান যোদ্ধা সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবীর কথা

সুলতান সালাহউদ্দিন আইউবী ছিলেন ইসলামের এক অমর বিস্ময়। আল্লাহর এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ইউরোপের ক্রুসেড বাহিনীর আগ্রাসনকে প্রতিহত করে তাদেরকে পশ্চাতে ছুঁড়ে দিয়ে ছিলেন। ইসলামের শত্রু ক্রুসেডদের শাসন থেকে বায়তুল মাকদাস, সিরিয়া ও ফিলিস্তিন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তিনি আরব উপদ্বীপ এবং পবিত্র দেশসমূহকে ইসলামের বহিরাগত শত্রুর জবর-দখলের বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। হাত্তিন যুদ্ধের পর ৫৮৩ হিজরীর ১৭ই রবীউল আউয়ালের সেই পুণ্য ও বরকতময় মুহূর্তটি দ্রুত নিকটবর্তী হল যার জন্য সুলতান সালাহউদ্দীন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন এবং অনেক বছর ধরে এর দিকে পিপাসার্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। ইহাই হল বায়তুল মাকদাস বিজয়।

কাযী ইবনে শাদ্দাদ বলেন, বায়তুল মাকদাসের বিষয়টি তাঁর কাছে এমন গুরুভার বলে মনে হতো যা পাহাড়ও বহন করতে সক্ষম নয়। ৫৮৩ হিজরী সনের ২৭শে রজব, সুলতান সালাহউদ্দীন বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করেন। দীর্ঘ নব্বই বছর পর এই প্রথম কেবলা-গৃহ ইসলামের কোলে মুসলমানদের হাতে ফিরে আসে; এই সেই প্রথম কেবলা-গৃহ যেখানে নবী মুহম্মদ (স) সকল নবী-রাসূলকে সাথে নিয়ে মেরাজের রাতে নামাজ আদায় করেন। সর্বজ্ঞ আল্লাহপাকের অসীম কুদরত যে, যে তারীখে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে মেরাজের সৌভাগ্যে ধন্য করেছিলেন ঠিক সেই চন্দ্র তারিখে সুলতান সালাহউদ্দীন বায়তুল মাকদাসে প্রবেশ করেন।

ইবনে শাদ্দাদ অন্য এক জায়গায় বলেন–সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ুবী ছিলেন অতি উদার মনা, দারাজহস্ত দানশীল এবং অতি

লজ্জাশীল; তাকে অপমানকারী অতিথিবৃন্দের প্রতি তিনি ছিলেন সদা হাস্যমুখ। বিদেশী দূতদেরকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করতেন যদিও সে কাফির সম্প্রদায়ের লোক হোক না কেন! আমি দেখেছি এক ব্যক্তি নাসেরায় তার নিকট উপস্থিত হল; তিনি তাকে সমাদরে ও সসম্মানে গ্রহণ করলেন; তাকে নিজের সাথে নিয়ে আহার্য গ্রহণ করলেন; এতদসত্ত্বেও তিনি তাঁর কাছে ইসলামকে পেশ করলেন এবং এর বিভিন্ন সৌন্দর্যের দিক তুলে ধরে তাকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন।

সুলতান সালাহউদ্দিন ছিলেন মহৎপ্রাণ এবং কোমল হৃদয়ের মানুষ। মজলুম ব্যক্তির ব্যথায় ব্যথিত হয়ে উঠতেন, দুঃখ-শোকে সমবেদনা প্রকাশ করতেন; তার বিপদে কাতর হয়ে পড়তেন। ইবনে শাদ্দাদের বর্ণিত একটি ঘটনায় এর প্রমাণ রয়েছে। তিনি তাঁর বইয়ে এভাবে বর্ণনা করেন–কোন একদিন আমি তাঁর খেদমতে এক ফিরিঙ্গী ব্যক্তির সামনে সওয়ারী হয়ে অবস্থান করছিলাম। এমন সময় এক তাজিক ব্যক্তি উপস্থিত হল; তার সাথে ছিল এক অতি ভীত রমনী; সে ছিল খুব ক্রন্দনশীলা, অবিরাম বুক চাপড়াচ্ছিল; অতঃপর তাজিক ব্যক্তিটি বলল এই মহিলা ফিরিঙ্গী ব্যক্তিটির নিকট হতে বের হয়ে আপনার সামনে উপস্থিত হতে চেয়েছে; আমি তাকে নিয়ে এসেছি। তখন সুলতান সালাহউদ্দীন দোভাষীকে বললেন, তিনি যেন তাকে তার ঘটনাটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।

মহিলাটি বলল– কতিপয় মুসলিম চোর গত রাতে আমার তাঁবুতে ঢুকে আমার কন্যাকে নিয়ে যায়, আমি গত রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সাহায্য চেয়ে অতিক্রান্ত করেছি। অতঃপর আমাকে ক্রীতদাসটি বলল– বাদশাহ খুবই দয়ালু, আমরা তোমাকে তার নিকট নিয়ে যাচ্ছি, তুমি তার কাছে তোমার মেয়ের সম্পর্কে আবেদন জানাবে। তাই তারা আমাকে আপনার নিকট নিয়ে এসেছে। আমি আপনাকে ছাড়া আর কারুর কাছে থেকে আমার মেয়ের খোঁজ-খবর জেনে নিতে পারবো না।

মহিলার আর্তি শ্রবণ করে সুলতান সালাহউদ্দীন তার প্রতি সদয় হলেন। তার চক্ষু দিয়ে অশ্রু বের হল। মানবতাবোধ তাকে উদ্দীপ্ত করে তুলল। তিনি নির্দেশ দিলেন "যে ব্যক্তি সেনা বাজারে যাবে সে যেন ঐ ছোট মেয়েটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নেয় কে তাকে কিনে নিয়েছে। অতঃপর তার ক্রেতাকে মূল্য পরিশোধ করে তাকে যেন দরবারে উপস্থিত করে।"

ব্যাপারটি সেই দিন সকালেই সকলকে জানিয়ে দেওয়া হলো। এক ঘণ্টা অতিক্রান্ত না হতেই এক অশ্বারোহী মেয়েটিকে তার কাঁধে নিয়ে দরবারে পৌঁছে দিল। তার উপর নযর পড়তেই মহিলাটি মাটির উপর অধোমুখে পড়ে যায়। এবং তার চোহারা ধূলি-ধূসরিত করে ফেলে। তার এ দৃশ্য দেখে লোকজন কেঁদে ফেলে।

অতঃপর মহিলাটি ভাবাবেগে আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠায়। আমরা জানিনা সে কী ভাষায় কী বলেছে? অতঃপর তার মেয়েটিকে তার কাছে সমর্পণ করা হল। মহিলাটি তাকে নিয়ে তাদের সেনাবাহিনীর কাছে ফিরে যায়।

সুলতান সালাহ উদ্দীনের ইন্তেকাল ৫৮৯ হিজরী সনের সফর মাসের সাতাইশ তারিখে রোজ বুধবার ফজর নামায বাদ সংঘটিত হয়। ইবনে শাদ্দাদ বলেন– সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী মৃত্যুর সময় সাতচল্লিশটি নাসেরী দিরহাম এবং স্বর্ণের একটি ছোট চামচ ছাড়া কোন স্বর্ণ-রোপ্য তার নিজ ধনাগারে রেখে যান নাই। রেখে যান নাই কোন দেশ, কোন ঘর, কোন জমাজমি, কোন বাগবাগিচা, কোন গ্রাম বা কোন ক্ষেত-খামার। নানা রকম মালিক মালিকানার কিছুই তিনি পেছনে রেখে যান নাই। কর্য করা ছাড়া তাঁর কাফন-দাফনের জন্য এক হুববা (১/১৬ দিনার) মূল্যের অর্থ আমরা হিসাবের মধ্যে দাখিল করতে সক্ষম হই নাই; এমন কি কাঁদামাটির তৈরী একটা বড় পাত্রের মূল্য পরিমাণ অর্থও ছিল না। অবশ্য তার কাফনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাপড় 'কাযী ফাযেল' তার জানা এক প্রস্থ কাপড় থেকে হাযির করে দিয়েছিলেন।

যে উত্তরে হৃদয় গলে

সম্ভবত তোমরা শুনেছো (অথবা অচিরেই তোমরা ইতিহাসের বইতে পাঠ করবে) মুসলিম বিশ্বের উপর হিজরী সপ্তম শতকে তাতার জাতির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কথা। তারা ছিল এক বিশাল ফিতনা ও অরাজকতা। এক কঠিন পরীক্ষা। ইসলামী বিশ্বকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত তীব্রভাবে প্রকম্পিত করে তুলেছিল।

প্রতিটি দেশ ও রাজ্যের মধ্যে তারা যেটারই মুখোমুখী হয়েছিল তা ধ্বংস ও উজাড় করে দিয়েছিল। মুসলিম বিশ্বের বিশাল বিস্তৃতি এবং বহু দেশ ও রাষ্ট্র থাকা সত্ত্বেও এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এই বিরাট বিপদের মুকাবিলা করতে পেরেছিলেন।

মানুষের মধ্যে হতাশা আর ভাগ্য ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশেষে একটি প্রবাদ বাক্য ছড়িয়ে পড়েছিল, "যখন তোমাকে বলা হবে: তাতার জাতি পরাজিত হয়েছে তখন আমরা এটাকে বিশ্বাস করবনা।" যা কিছু পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতো তা ধ্বংস সাধনকারী এই তাতার জাতির বর্বর আক্রমণের উদাহরণ দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাদের সেনাপতি চেঙ্গিশ খান সম্পর্কে যেমন এক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মন্তব্য–

তিনি তার অভিযান পথে প্রবহমান নদী ছাড়া বিদ্যমান প্রতিটি শহর নগর নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন। মরু-প্রান্তরসমূহ শরণাপন্ন এবং মৃত্যু-সন্নিকটবর্তী মানুষ দ্বারা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। যে অঞ্চল একদিন বসবাসকারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, জমজমাট

ছিল, সেখান দিয়ে তার চলার পর কোন প্রাণী বেঁচে ছিল না, শুধু বেঁচে ছিল শিয়াল, কুকুর আর চিল শকুন।

যুক্তি অনেক কিছুই মেনে নিতে পারে এবং মানুষ অনেক কিছুই ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে, কিন্তু যে তাতার জাতির দৃষ্টিতে অন্য কোন জাতি ও লোক মুসলমানদের চেয়ে অতি হীন ও নিকৃষ্ট ছিল না সেই বিজিত ও পরাজিত মুসলিম জাতির ধর্মকে তারা মেনে নিয়ে ধর্মপরায়ণ হবে– এটা কখনো হতে পারে না। অথচ যা অসম্ভব মনে করা হতো তাই বাস্তবে পরিণত হল একদিন। আর তা আল্লাহ তায়ালার অপার অনুগ্রহে আল্লাহর পথে একনিষ্ঠ দাওয়াতকারী আল্লাহ্ ওয়ালা ওলামায়ে কেরামের অবদানের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছিল।

তোমাদের এসব আল্লাহ ওয়ালাদের বহু কাহিনীর মধ্যে একটি কাহিনী শোনাচ্ছি–

কাশগড় রাজ্যের রাজার ছেলে তাইমুরলং। তিনি ছিলেন যুবরাজ; তখনো তিনি রাজমুকুট ধারণ করেন নাই; এবং রাজ্যের ক্ষমতা পেয়ে শপথ গ্রহণও করেন নাই। অবশ্য তার জন্য এক মৃগয়া-অঞ্চল ছিল সেখানে তিনি শিকার করতেন, সেখানে তিনি এবং তার শিকার কার্যে সহায়তাদানকারী সঙ্গী-সাথীরা ছাড়া আর কেউ প্রবেশ করতে পারতো না।

তৎকালীন যুগে রাজা-বাদশাহরা পশুপাখী শিকার করার এ সব অঞ্চল গ্রহণ করে এবং এর আশ-পাশের এলাকায় শিকার করে আত্মাভিমানী হয়ে থাকতেন। এটা ছিল তাদের সম্মান ও সম্ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মাভিমান বিশেষ। তাই এসব অঞ্চল যুবরাজ এবং তার পারিষদবর্গের মধ্যস্থ শিকারীদের দল ছাড়া অন্যান্যদের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা ছিল। এর মধ্যে কোন প্রলুব্ধ ব্যক্তি তার

শিকারের লালসা মিটাতে পারত না এবং কোন বহিরাগত ব্যক্তিও এতে ঢুকতে পারত না।

কিন্তু আল্লাহ পাক তার এমন এক নিয়তি নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যা তুর্কীস্তানের এ শাসক গোত্র এবং বিশ্ব পদদলনকারী এ জাতির অনুসরণকারীদের ভবিষ্যৎকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। উহা তাদের শিকার করার এবং আত্মাভিমানের বিশেষ মৃগয়া ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে চির সৌভাগ্যের চারণ ক্ষেত্রে (বেহেশতের পথে) ফিরিয়ে আনে; উহা তাদেরকে ইসলাম ও মুসলিম জাতির পাহারাদারী এবং এমন এক বিশাল বিস্তৃত রাষ্ট্র সৃষ্টির দিকে ফিরিয়ে দেয় যার অধিবাসীরা ইসলাম গ্রহণ করতে এবং এর পতাকাকে সমুন্নত করতে থাকে। এসব আল্লাহওয়ালাদের অনেক কাহিনীর মধ্য থেকে এমন একটি কাহিনী তোমাদের কাছে পেশ করছি যা এই বর্বর তাতার জাতিকে ইসলামের দিকে অগ্রসর হওয়ার মর্যাদায় ফিরিয়ে আনে।

শায়েখ জামালুদ্দীন (রহ) বুখারা নগর থেকে বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল একদল ব্যবসায়ী। তিনি যুবরাজ তাইমুর লঙ্গের পশু শিকারের জন্য এ মৃগয়া ভূমি এবং আশপাশের অঞ্চলের কোন খোঁজ-খবর রাখতেন না।তিনি দলবল এর ভিতর ঢুকে পড়লেন। রাষ্ট্রীয় পাহারাদারদের হাতে ধরা পড়লেন।

খবর পেয়ে শাসনকর্তা নির্দেশ দিলেন– অনুপ্রবেশকারীদের পাকড়াও করে যেন হাত-পা বেঁধে নিয়ে আসা হয় এবং তাঁর সামনে তাদেরকে মুছলা (নাক, কান, হাত, পা কাটা) করে দেওয়া হয়।

তাদেরকে দরবারে আনা হল; তাতারীরা পারসিক মুসলিমদের দিকে অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে।

অতঃপর যুবরাজ তাইমুর এবং শায়েখ জামালুদ্দীনের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কথোপকথন চলতে থাকে।

ক্রোধান্বিত হয়ে যুবরাজ বলল–এ ভূখণ্ডে ঢুকবার সাহস তোমরা কী ভাবে পেলে? শায়েখ বললেন, আমরা বিদেশী লোক, অসাবধানতা ও অজ্ঞতাবশত এখানে ঢুকে পড়েছি। আমরা জানিনা যে আমরা নিষিদ্ধ ভূখণ্ডে এসেছি।

যুবরাজ–তোমরা কোন্ জাতি?

তারা বলল– আমরা পারসিক মুসলিম।

যুবরাজ বলল– যে কোন পারসিক ব্যক্তি অপেক্ষা একটা কুকুর বহু দামী।

এ সময় আল্লাহ তায়ালা শায়েখের অন্তরে তাঁর জন্য নির্ধারিত এমন এক উত্তরের ভাষা নিক্ষেপ করলেন যা বিজয়ীদেরকে বিজয় এনে দেয়, জুলুমকারীদের লাঞ্ছনা এনে দেয়; এবং এই ইসলামে বিশ্বাস আনার জন্য তাতার নেতার অন্তরকে সম্প্রসারিত করে ।

শায়েখ বললেন– হ্যাঁ, আমরা অবশ্যই কুকুরের চেয়ে ঘৃণ্য এবং খুব মূল্যহীন ছিলাম যদি না আমরা সত্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হতাম।

এই জওয়াব শ্রবণ করে তাতারী নেতা হতভম্ব হয়ে গেলেন; এবং নির্দেশ দিলেন– 'মৃগয়া (পশু শিকার) থেকে তিনি ফিরে আসার পর এই সাহসী পারসিককে যেন তার সামনে নিয়ে আসা হয়।

অতঃপর যখন তাতারী নেতা শায়েখের সাথে নির্জনে বসে গেলেন, তাকে প্রশ্ন করলেন–তার ঐ কথার অর্থ কী? তার সেই ধর্ম কী?

শায়েখ জামালুদ্দীন ইসলামের নিয়ম-নীতি সাহসিকতা ও গৌরবের সাথে বর্ণনা করলেন। ফলে তাতার নেতার অন্তর খুলে গেল; তার হৃদয় মোমের মত গলে যাওয়ার উপক্রম হল। শায়েখ তার সামনে কুফরীকে এমন বিভৎস চিত্রে চিত্রায়িত করলেন যে, এর সাথে তার এতদিনকার বিশ্বাস ও ধারণাসমূহের ভ্রান্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে গেলেন।

তিনি বললেন– এখনই যদি ইসলাম গ্রহণ করি তাহলে আমি আমার প্রজাদেরকে সরল পথের দিকনির্দেশনা দিতে সক্ষম হবো না। সুতরাং আমাকে কিছুটা অবকাশ দিতে হবে; যখন পৈত্রিক রাষ্ট্রের সিংহাসন আমার কাছে ফিরে আসবে তখন অবশ্যই আপনি আমার কাছে ফিরে আসবেন।

অতঃপর শায়েখ জামালুদ্দীন নিজ দেশে ফিরে গেলেন, এবং সেখানে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর তিনি যখন মৃত্যুর নিকটবর্তী হলেন পুত্র রশীদ উদ্দীনকে বললেন–"একদিন যুবরাজ তাইমুর লঙ্গ এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হয়ে যাবেন। সুতরাং তুমি কখনো তার কাছে যেতে ভুলে যাবেনা; তুমি তার কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে তাকে ছালাম জানাবে, এবং তিনি আমার সাথে যে অকাট্য অঙ্গীকার করেছিলেন তা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে ভয় করবে না।"

মাত্র সামান্য দু বছর অপেক্ষা করে রশীদ উদ্দীন খান সেনাবাহিনীর (তাতার বাহিনী) কাছে যাত্রা করলেন। এ সময় তাইমুর লঙ্গ রাজমুকুট ধারণ করে তার পৈত্রিক সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। কিন্তু চিন্তার বিষয় হল এই বিদেশী পারসিক মুসলিম তাঁর কাছে কেমন করে যাওয়ার পথ ও উপায়

পাবে এবং তার সামনে হাজিরা দিতে সক্ষম হবে? রশীদ উদ্দীন একটা সুন্দর কৌশলের আশ্রয় নিলেন।

একদিন খুব ভোরে তিনি আযান দিলেন। দুর্ধর্ষ তাতার নেতা সে আযান শুনলেন এবং তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেলো এবং তা তাঁর রাগ ধরিয়ে দিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই দুঃসাহসী উচ্চ কণ্ঠ ব্যক্তিটি কে যে সম্রাটের শান্তির বিঘ্ন ঘটাতে পরোয়া করে না, এবং তাঁকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করে না?

তাঁকে জানানো হল যে, এক বিদেশী পারসিক মুসলমান তার ধর্ম অনুযায়ী উচ্চ আওয়াজে আযান দিয়ে নামায পড়ছে। তিনি তাকে হাযির করে তার সামনে মুসলা (হাত, পা, নাক, কান কাটা) করার নির্দেশ দিলেন। এই সুযোগে রশীদ উদ্দীন তার পিতার পত্রখানা পৌঁছে দিলেন। তাইমুর লঙ্গ তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করে বললেন, হ্যাঁ সত্যই আমি আমার পিতার সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি তা স্মরণ করে চলেছি, কিন্তু সেই সাধু শায়েখ ব্যক্তির কি অবস্থা হল যে তিনি নিজে হাজির হলেন না!

রশীদ উদ্দীন তাকে বললেন–তিনি দুনিয়ার জীবন ত্যাগ করে পরকালে পাড়ি দিয়েছেন।

সম্রাট দুঃখ ও আনন্দ মিশ্রিত মেজাজে এ কথাগুলো শুনলেন। অতঃপর তিনি কালিমায়ে শাহাদাত স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর সম্রাট তাইমুর লঙ্গ তার আমীর-ওমারাদেরকে স্বাগত জানিয়ে এক এক করে তাদের সামনে ইসলাম পেশ করলেন। তারা সকলে ইসলাম গ্রহণ করলেন। ইসলামের সূর্য উদয় হয়ে গেল, তার আলোকে আঁধার মিটে গেল; মানুষ দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করল।

এমনিভাবে আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরাম, প্রভাবশালী ওয়ায়েজীন, এবং একনিষ্ঠ ইসলামী মুবাল্লেগীনের অনুগ্রহে পরবর্তী তাতার উপজাতির মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল।

একজন নামকরা ইংরেজ ঐতিহাসিক বলেন–ইসলাম তার প্রথম ক্ষুদ্র মর্যাদা এবং ঐতিহ্য সূত্রে প্রাপ্ত হালকা বর্ষণের মধ্য দিয়ে উদগত হয়েছিল। এবং মুসলিম প্রচারকদের মাধ্যমে ঐ সব বিজয়ী ব্যক্তিদেরকে আকর্ষণ করে তাদের ইসলাম গ্রহণ করাতে সক্ষম হয়েছিল যারা তাদের আগের সকল সাধনা ও প্রচেষ্টা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাতে নিঃশেষ করে দিয়েছিল।

তাইমুর লঙ্গের প্রশ্নের উপর শায়েখ জামালুদ্দীনের পাল্টা ইলহামী জওয়াবের ভিতর বর্বর তাতার উপজাতির মধ্যে ইসলাম-বিস্তারে নিঃসন্দেহে তাঁর (জামালুদ্দীনের) বিশাল মর্যাদা রয়েছে।

আল্লাহপাকের আনুকূল্য এবং বিধান মিশ্রিত ঈমান ও ইয়াকীন থেকে উৎসারিত এমন অনেক কথা রয়েছে যার প্রভাব ও উপযোগিতা বিপুল সেনা বাহিনী, প্রচুর হাতিয়ার এবং দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহ অপেক্ষা অধিক ও প্রচুর!

ক্ষমার মাহাত্ম্য

মহানবী (স), সাহাবায়ে কেরাম, খুলাফায়ে রাশেদা এবং তাঁদের পরবর্তী অনুসারীদের সকল যুগের বহু কাহিনী ও তথ্য আমরা পাঠ করেছি। তাতে আল্লাহপাকের বাণীই ছিল সবার উচ্চে। রাসূলের আদর্শই ছিল একমাত্র আদর্শ। আর এর কল্যাণ ছিল বিজয়ী; ধর্মের মিনারের চূড়া ছিল সবার ঊর্ধ্বে।

তবে ইসলামরূপ বৃক্ষ সর্বদা ফল ফলিয়ে যাচ্ছে; এর মধুচক্র (মৌচাক) মধু দিয়েই যাচ্ছে। ঈমান ও নৈতিকতার সৌন্দর্যে পুষ্ট বহু কাহিনীর মধ্যে একটি কাহিনী তোমাদের কাছে বর্ণনা করতে চাই।

হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী। এই যুগে ইমাম সাইয়্যেদ আহমদ ইবনে ইরফান শহীদ (১২০১-১২৪৬) ভারতের বুকে ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতার মেহনতে পরীক্ষিত লোকদের একটি প্রশিক্ষণ সংগঠন গড়ে তোলেন। এটি ছিল ইসলামের কেন্দ্রভূমি (মদীনা) থেকে বহু দূরে এবং তা কতকগুলো দুর্বল রাষ্ট্র (সীমান্ত প্রদেশ) নিয়ে সৃষ্টি হয়।

এ সংগঠনটি খোদাভীতি, নির্ভুল বিশ্বাস, সুন্নাতে রাসূলের অনুসরণ, জেহাদ ও শাহাদাতের আকঙ্ক্ষা এবং আল্লাহর দিকে আহ্বান জানানোর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

খেলাফতে রাশেদার নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার, জনগণ ও সমাজ জীবনে শরীয়তী বিধান প্রয়োগের উদ্দেশ্যে একটি ইসলামী রাষ্ট্র নির্মাণে তিনি সর্বাত্মক জেহাদী প্রচেষ্টা চালান।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের এক খাদেম, যাকে লাহোরী নামে ডাকা হতো, একবার ঝগড়া বাঁধায়। লোকটি ছিল বিনীত চেহারার। মুজাহিদদের ঘোড়ার সেবা করত; তাদের ঘাস খাওয়াতো; লোকটার ঝগড়া বেঁধে ছিল অন্য যে লোকটার সাথে তার নাম হল ইনায়েত উল্লাহ। সাইয়্যেদ আহমদের নিকট তার একটা বিশেষ অবস্থান ও প্রভাব ছিল। তিনি ছিলেন সাইয়্যেদ আহমদের পুরোনো বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম। ঝগড়ায় তার রাগ ধরে যায়, এবং লাহোরীকে এক ঘুষি মেরে দেন। লাহোরী এতে মাটিতে পড়ে যায়, এবং যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে।

সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের কাছে সংবাদটি পৌঁছে গেল। তিনি ব্যাপারটি জানতে পেরে ইনায়েত উল্লাহ খানকে ভর্ৎসনা করেন এবং খুব নিন্দা, তিরস্কার করেন। এবং এ কথাও বললেন যে, আমার নিকট তোমার একটা মর্যাদা ও বিশেষ অবস্থান আছে বলে আজ মানুষকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য এবং বল প্রয়োগ করার দুঃসাহস দেখিয়েছ। অতএব তোমাকে ইহা যেন ধোঁকায় না ফেলে। তুমি আর লাহোরী আমার কাছে সমান সমান। কারুর উপর কারুর ফযিলত ও প্রাধান্য নেই। এখানে সবাই দ্বীনের জন্য একত্রিত হয়েছি মাত্র।

সাইয়্যেদ সাহেব উভয়ের বিষয়টা সেনা বিচারকের নিকট হাওলা করে দিলেন। এবং তাকে বলে দিলেন উভয়ের ব্যাপারে আপনাকে যেন ইনসাফ বিমুখতা ও তোষামুদিতা ধরে না বসে; এবং তাদের মধ্যে যে জিনিসটি আল্লাহ আপনাকে দেখিয়ে দেবেন

উহার সাহায্যে বিচার করবেন; আপনি বিশ্বাস ভঙ্গকারীদের সমর্থনে বিতর্কে যাবেন না।

বিষয়টি তো সুস্পষ্ট এবং পরিস্কার ছিল। সুতরাং লাহোরীর জন্য ইনায়েত উল্লাহর কাছ থেকে কেসাস নেওয়ার অধিকার ছিল। এবং তাকে যেমন ইনায়েত উল্লাহ ঘুষি মেরে ছিলেন তেমন লাহোরীও তাকে ঘুষি মারবে। কেননা আঘাতের বিনিময় আঘাত। কিন্তু লোকে ক্ষতির আশংকা করল; তারা ভয় পেয়ে গেল এই কেসাসের শেষ পরিণতি প্রশংসনীয় নাও হতে পারে। হয়তো ইনায়েত উল্লাহর রাগ ধরে যেতে পারে; সে তার উপর উত্তেজিত হয়ে পুনর্বার চড়াও হতে পারে; এবং তা থেকে বাঁচতে মানুষের মধ্যে নতুন ফেতনার সৃষ্টি হয়ে যাবে।

লোকেরা চেষ্টা করল যাতে লাহোরী তার অধিকার ছেড়ে দেয় এবং সম্ভাব্য অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য প্রতিপক্ষের প্রতি আল্লাহর ওয়াস্তে উদার হয়ে যায়। এবং বিচারকও তাকে তুষ্ট করার ইচ্ছা করছিল। লোকে লাহোরীকে বুঝাইতে চেষ্টা করল। তারা তাকে বলল, তুমি যখন তোমার প্রতিপক্ষকে ক্ষমা করে দেবে, তোমার প্রাপ্য থেকে নিচে নেমে আসবে তখন আল্লাহর কাছে তোমার বিরাট পুরস্কার পাওনা হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন-– "ফামান আফা ওয়া আস্‌লাহা ফা আজরুহু আলাল্লাহি ইন্নাহু লা য়ুহিব্বুয্‌ যালেমীন। অলিমানিন্‌ তাছারা বা'আদা যুলমিহি ফাউলাইকা মা আলাইহিম মিন্‌ সাবীল। ইন্নামাস সাবীলু আলাল্লাযীনা ইয়াযলিমুনান না সা ওয়া য়াবগুনাফিল আরদি বিগাহরিল হাক্কিক, উলাইকা লাহুম আযাবুন আলীম। ওয়ালিমান সাবারা ওয়া গাফারা ইন্না যালিকা লিমান আয্‌যামিল্‌ উমুর।" (সুরা শুরা, ৪০-৪৩)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে, আল্লাহর কাছে তার পুরস্কার রয়েছে; আল্লাহ পাক জালেমদেরকে পছন্দ করেন না। তবে যে ব্যক্তি বা যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না। কেবল তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে যারা মানুষের উপর জুলুম-অত্যাচার

করে, এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়; তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আর যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করে ক্ষমা করে দেয় তা নিশ্চয় দৃঢ় সংকল্পেরই কাজ।

সুতরাং তুমি যদি তোমার অধিকার আদায় কর তাহলে তুমি আর তোমার প্রতিপক্ষ সমান সমান হয়ে যাবে; ফলে তুমি পুরস্কার ও ধন্যবাদ পাওয়ার অধিকারী হবে না।

লাহোরী সরলতার সাথে বলল– আচ্ছা আমি যদি আমার অধিকার আদায় করি এবং আমার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কেসাস গ্রহণ করি তাতে কি আমার কোন পাপ হবে ?

সকলেই বলল, না, না। বরং আল্লাহ তো বলেছেন যে তার জুলুম ভোগ করার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহলে তার উপর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

লাহোরী বলল– তাহলে আমি আমার অধিকার গ্রহণ করব এবং আমার প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কেসাস নিয়ে নেব।

তখন লোকে হতাশ হয়ে পড়ল; তাদের আশা ভঙ্গ হল বিচারক ইনায়েত উল্লাহকে লাহোরীর সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। এবং লাহোরীকে বলল, লোকটাকে ধর এবং তাকে তুমি আঘাত করো যেরূপ তোমাকে আঘাত করেছে এবং তার কাছ থেকে কেসাস (প্রতিশোধ) নিয়ে নাও।

লাহোরী বলল–এটিই কি আমার অধিকার যে, তিনি যেভাবে আমাকে মেরেছেন, সেইভাবে আমি তাকে মারি এবং তার কাছ থেকে কেসাস নিয়ে নেই।

বিচারক বলল– হ্যাঁ।

লোকজন বিচলিত হয়ে পড়ল এবং বিশ্বাস করে ফেলল যে, লাহোরী নিশ্চয়ই ইনায়েত উল্লাহকে মারবে এবং তার কাছ থেকে কেসাস নিয়ে নেবে।লাহোরী বলল–ভাই সব! আপনারা সাক্ষী থাকেন, নিশ্চয় বিচারক আমার হক দিয়ে দিয়েছেন; এবং আমার প্রতিপক্ষের উপর আমাকে ক্ষমতা দান করেছেন; এবং তার বিরুদ্ধে সঠিক বিচার করেছেন। এখন আমি এমন এক ব্যক্তি যে, আমি আমার প্রতিপক্ষের উপর ক্ষমতাশালী; কেউ কেসাস গ্রহণ করা থেকে আমাকে বাধা দিতে পারছেনা। এবং আমার এবং তার মাঝখানে কোন কিছু অন্তরায় হয়ে যাচ্ছেনা এবং আমি কাউকে ভয় করছিনা। তবে আমার ভাইয়েরা আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি আমার ভাইকে ক্ষমা করে দিলাম এবং আল্লাহর ওয়াস্তে তার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার অধিকার ও হক ছেড়ে দিলাম। এই বলে লাহোরী এগিয়ে গেল এবং ইনায়েত উল্লাহ খানের সাথে গলাগলি করল এবং তাকে বুকে চেপে ধরলো এবং মুসাফাহ করল। জনগণ মারহাবা, মারহাবা বলে উল্লাস ধ্বনি করল এবং বললো হে লাহোরী আল্লাহ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুক, আল্লাহ তোমার মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করুক। সত্যই তুমি মহানুভব পুরুষের মত কাজ করেছো; তুমি বীর যোদ্ধার মত কর্ম সম্পাদন করেছো।

আর এভাবেই লাহোরী আল্লাহ পাকের নিম্ন বর্ণিত কথা অনুযায়ী আমল করেছেন– "অল্লাযীনা ইযা আসাবাহুমুল্ বাগ্য়ু হুম্ ইয়ান তাসিরুন। অজাযাউ সাইয়িয়তিন সাইয়ে য়াতুন মিসলুহা ফামান আফা অস্ লাহা ফা আজরুহু আলাল্লাহি, ইন্নাহু লায়ুহিব্বুয্ যালিমীন।" (সুরা শুরা, ৩৯-৪০) অর্থাৎ এরাই হল তারা যারা অত্যাচারিত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে; এবং মন্দের প্রতিফলন অনুরূপ মন্দ; এবং যে ক্ষমা করে দেয় এবং আপোষ নিষ্পত্তি করে তাদের পুরস্কার আছে আল্লাহর নিকট; আল্লাহ জালিমদেরকে পছন্দ করেন না।

বেহেশ্তী আনন্দে মৃত্যুদণ্ড বাতিল

১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ (১২৮০ হিজরি) ২ মে, সোমবার ইংরেজ বিচারক এডওয়ার্স আম্বালার বিচারালয়ের চেয়ারে বসেছেন। তার পাশে দেশের বিভিন্ন এলাকা হতে আগত আরো চারজন সাহায্যকারী উপদেষ্টা মুকাদ্দামার রায় দেখার জন্য বসে আছেন। আর তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন দশজন ব্যক্তি, যাদের মুখমণ্ডল ও সৌম্য চেহারা বলে দিচ্ছে তাদের নির্দোষ ও ভদ্রতার কথা। কিন্তু তাদেরকে গণ্য করা হয়েছে বিরাট অপরাধী ও দোষী ব্যক্তিরূপে। কেননা তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে ভারতের বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছে, তারা আফগান সীমান্তে সাইয়্যেদ আহমাদ বিন ইরফান শহীদ ও মুজাহিদশ্রেষ্ঠ শায়েখ ইসমাইল শহীদের আনসার বাহিনীকে টাকা-পয়সা এবং লোকজন দিয়ে সহায়তা করেছেন। তারা দেশের অভ্যন্তরে থেকে অদ্ভুত কৌশলে গোপনে এ সব প্রেরণ করছেন। তারা তাদের চিঠিপত্রে সাংকেতিক ভাষা ব্যবহার করছেন; তারা নিজেরাই বৃটিশ রাজ্যের প্রজাদের কাছ থেকে চাঁদা ও অর্থ জমা করে সেগুলো বিদ্রোহীদের কেন্দ্রে প্রেরণ করে থাকেন; সরকার বৃটিশ সেনাবাহিনীর মধ্যে লুকিয়ে থাকা মুসলিম বাহিনীর বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে তা অবগত হতে পেরেছে। তাদেরকে পাটনা, থানেশ্বর এবং লাহোরে পাকড়াও করা হয়েছে। এবং তাদের বিরুদ্ধে মোকাদ্দমা দায়ের করা হয়েছে। আজ হচ্ছে সেই দিন যেদিন তাদের বিরুদ্ধে হুকুম বা রায় প্রদান করা হবে।

আদালত দর্শণার্থীতে ভরে গেছে। নতুন আদালত ভবনে মুকাদ্দমা বসেছে; রায় প্রদান করার সময় হয়ে এসেছে। অপলক নেত্রে লোক তাকিয়ে আছে; সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে; হৃদপিণ্ডের স্পন্দন ব্যাকুলিত হয়ে উঠেছে; পিন পতন-স্তব্ধতা বিরাজ করছে। এমন সময় বিচারক ক্রোধান্বিত কণ্ঠে এমন এক সুশ্রী সুন্দর যুবককে সম্বোধন করে বলে উঠলেন, যে যুবকের বাহ্যিক চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল নিশ্চয় তিনি কোন স্বচ্ছল পরিবারের শরীফ ভদ্র সন্তান হবেন।

বিচারক বলছেন–

জাফর! তুমি একজন বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তি; রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্পর্কে তোমার ভাল জানা আছে। তুমি তোমার দেশের এক জন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, ভদ্র পরিবারের সন্তান, কিন্তু তুমি তোমার বুদ্ধি ও মেধাকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ও ষড়যন্ত্রে ব্যয় করেছো। বিদ্রোহের ঘাটিগুলোতে ভারত থেকে লোকজন ও টাকা-পয়সা পাঠানোর মাধ্যম তুমিই হয়েছো। অবাধ্যতা ও বিরোধিতা কেবল তুমি বৃদ্ধি করেই চলেছো। তুমি যে এ দেশের এবং এ রাষ্ট্রের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী একনিষ্ঠ নাগরিক তা প্রমাণ করতে পার নাই।

তাই আজ এখন তোমার বিরুদ্ধে রায় হচ্ছে, তোমার মৃত্যুদণ্ড; এবং তোমার স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিয়ে মৃত্যুর পর তোমার মৃতদেহ তোমার আত্মীয়-স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হবে না। বরং দুর্ভাগ্য ও হতভাগ্যদের কবরস্থানে সকল প্রকার লাঞ্ছনা দিয়ে দাফন করা হবে। আমি যখন তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো দেখতে পাবো তখন আমি অতি খুশী এবং অতি ভাগ্যবান হবো।

যুবক জাফর গভীর নিস্তব্ধতা ও গাম্ভীর্যের সাথে কথাগুলো শুনলেন। কিন্তু তার মধ্যে কোন পরিবর্তন আসলনা; এতটুকু বিচলিত হলেন না। বরং তিনি বিনীতভাবে বললেন– নিশ্চয় জীবন-মৃত্যু একমাত্র আল্লাহর হাতে; তিনিই বাঁচান তিনিই মারেন। জনাব বিচারক! তুমি নিশ্চয়ই জীবন-মৃত্যুর মালিক নও। আমি জানিনা আমাদের মধ্যে অর্থাৎ তোমার ও আমার মধ্যে কে মৃত্যুর ঘাটে আগে পৌঁছবে?
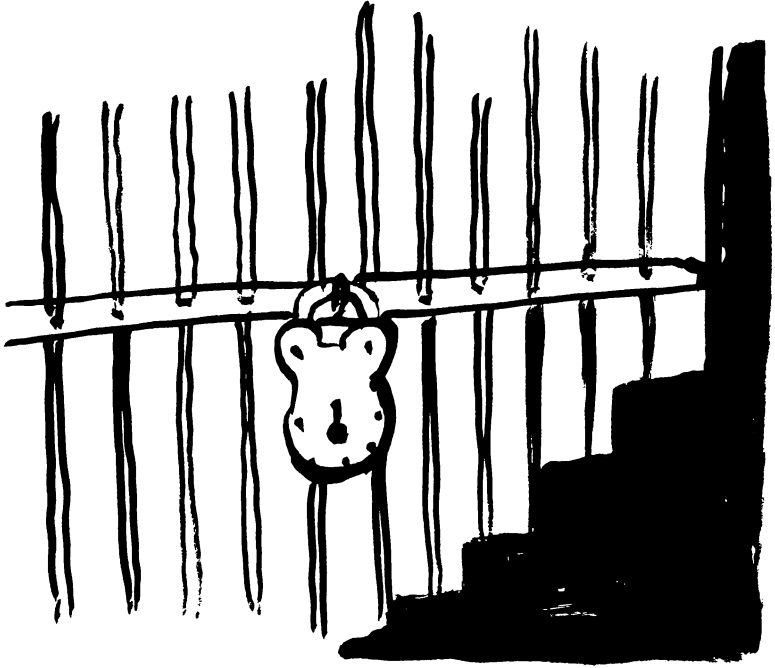
তারপর তিনি আবৃত্তি করলেন–

"ফাঅল্লাহি মা আদরী অ ইন্নী লা আওজালো। আলা আইয়িনা তাগদুল্ মানিয়াতু আও আলো"–আল্লাহর শপথ আমি তো জানিনা আমাদের মধ্যে কার উপর মৃত্যু প্রথমে আগমন করবে; আর কার দেরী করবে।

বিচারক এডওয়ার্স জাফরের কথা শুনে রাগে ক্ষোভে জ্বলে উঠলো, এবং উন্মাদতুল্য হয়ে গেল; কিন্তু তার করার কিছুই ছিল না। কেননা তার ধনুকের শেষ তীর ছুঁড়ে দিয়েছে, যা ফিরিয়ে নেওয়ার মালিক সে আর হতে পারছে না। যুবক মুহাম্মদ জাফর, যখন এই রায় জারী হল তখন অত্যন্ত পুলকিত হয়ে উঠলেন; আনন্দে তার মুখমণ্ডল ঝলমল করে উঠল। যেন মনে হচ্ছিল বেহশত, হুরপরী এবং বালাখানাগুলো তার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

সেসব কবির কবিতার পঙতিতে লিখিত কথার ন্যায় আকৃতি ধারণ করে বিদ্যমান রয়েছে-

"হাযাল্লাযী কানাতিল্ আইয়ামু তান্তাযিরু ফাল ইউফিল্লাহি আকওয়ামুবিমানা যারু" অর্থাৎ এতো তা-ই দিনগুলো যার অপেক্ষা করছিল (আপনাদের জন্য) কসম আল্লাহর লোকেরা যা মানত করেছিল তা যেন তিনি পূর্ণ করে দেয়।

এ দৃশ্য দেখে লোকে বিস্ময়বোধ করল; ইংরেজ জেলার মুহাম্মদ জাফরের নিকটবর্তী হল; জেলারের নাম বার্সন। সে এসে তাকে বলল, আমি আজকের মত আর কোন দিন আপনাকে এমনভাবে দেখি নাই। আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে অথচ আপনি রায় শোনার পর থেকে আনন্দিত ও হাসি-খুশীতে ভরা।

মুহাম্মদ জাফর বললেন- "আমার কি হয়েছে যে, আমি খুশী হবো না এবং আনন্দিত হবো না আল্লাহ তো আমাকে তার রাহে শাহাদাতের রেজেক দান করেছেন। ওরে হতভাগা ইংরেজ তার মিষ্টতা কী তা তুমি কি করে বুঝবে !

বিচারক এডওয়ার্স আরো দুজনের উপর মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে একজন হলেন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি। তার উপর সাধু-সজ্জন এবং আবেদ মানুষের নিদর্শন ও আলামত জ্বল-

জ্বল করছিল। তিনি খুশী ও কৃতজ্ঞতা সহকারে এ খবর বরণ করে নিয়েছিলেন। এই বয়োবৃদ্ধ লোক হলেন মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাদেকপুরী; তিনি ছিলেন এ দলের আমীর। দ্বিতীয় ব্যক্তি হলেন একজন যুবক; জানা যায় তিনি ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তি। তিনি পাঞ্জাবের লোক ছিলেন। উনার নাম আলহাজ্ব মুহাম্মদ শফী।

বিচারক এডওয়ার্স বিচারে অন্য আটজনকে যাবজ্জীবন ও দ্বীপান্তরের নির্দেশ দিয়েছিলেন। জনগণ বিচারের রায় দুঃখ ও বিষাদের মধ্যেই শুনল; তারা মর্মাহত হল; অশ্রুপাত করল; রাজপথের দু ধারে নর-নারীরা একত্রিত হয়ে কারাগারের দিকে গমনকারী ঐ সব মাজলুমদেরকে শুধু দেখতে থাকল আর তাদের দুঃখ-শোক প্রকাশ করতে থাকল।

তাঁরা কারাগারে পৌঁছে গেলেন; তাদের সকল কাপড়-চোপড় খুলে নেওয়া হল। পরিয়ে দেওয়া হল অপরাধীর পোষাক; তিনজনের প্রত্যেককে অন্ধকারময় এক একটি সংকীর্ণ কুঠরীতে বন্দী করা হল। তাতে না চলতে পারছিল বায়ু এবং না ঢুকতে পারছিল আলোর কণা। তাঁরা কঠিন গরমের মধ্যে রাত অতিবাহিত করলেন। প্রভাতের আলোতে দয়া করে তাদের জন্য ফাঁকা জায়গায় থাকার ব্যবস্থা হল।

কারা প্রহরীরা চোখের সামনে তাদের ফাঁসির দড়ি এবং কাষ্ঠ দণ্ড ঠিক করে যাচ্ছিল; অথচ তাঁরা প্রত্যেকে নির্বিকার চিত্তে এরং প্রশান্ত মনে সব কিছুই দেখছিল, কিন্তু না ছিল তাদের উপর কোন ভয়ের চিহ্ন, না ছিল দুঃখিত মনোভাব।

মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাদেকপুরী ছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী খুশী ও প্রফুল্ল। মনে হচ্ছিল তিনি যেন বেহেশতের

মধ্যেই বেহেশতের শওক অনুভব করছেন, এবং বেহেশত নায়ীমের এনতেজারে ও অপেক্ষায় রয়েছেন। তিনি ভাবাবেগে সুরেলাকণ্ঠে কবিতার পঙতিমালা আবৃত্তি করছিলেন।

ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলবার সময় সাহাবা হযরত খুবাইব (রা) যে কবিতা পাঠ করেছিলেন মাওলানা ইয়াইয়া আলী সাদেকপুরী তেমনি পাঠ করতে লাগলেন–

"অলাসতু উবালী হীনাউক্‌তালু মুসলিমা আলা আইয়ী জানবিন্ কানা ফিল্লাহি মাসরায়ী।"

এমনিভাবে তিনি সর্বদা উজ্জ্বল হাসি-খুশী ও আনন্দময় চেহারা নিয়ে থাকলেন। তার মন ছিল প্রশান্ত, অন্তর ছিল প্রফুল্ল; নামাযের মধ্যে বিনয়ী ভাব, আনন্দের ভিতর ইবাদতে লিপ্ত থাকা, জিকির, তাসবীহ্ পাঠ, তেলাওয়াতে কুরআনে ভাবাবেগ এবং কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি ছিল তার অবিচ্ছেদ্য সাথী।

এদিকে হযরত জাফর সাদেকপুরীর কথাই ফলবতী হল। ইংরেজ বিচারক এডওয়ার্স রায় ঘোষণার পর পরই অকস্মাৎ মৃত্যু বরণ করল। এবং ইংরেজ জেলার বা কারারক্ষী বার্সন উন্মাদ হয়ে গেল; এই সেই বার্সন যে মুহাম্মদ জাফর সাদেককে হাতকড়া পরিয়েছিল এবং একদিন সকাল ৮টা থেকে শুরু করে রাত ৮ টা পর্যন্ত পিটিয়ে ছিল। এ হতভাগা ইংরেজ উন্মাদ অবস্থায় নিকৃষ্ট মৃত্যু বরণ করেছিল। এদের উভয়ের ভাগ্যে জাফর সাদেকের ভয়ংকর কথা বাস্তবায়িত হল। অনেক ইংরেজ অফিসার এ সকল কারারুদ্ধ ব্যক্তিদেরকে শত্রু ভেবে গালি-ভর্ৎসনা করে আনন্দ পাওয়ার জন্য কারাগারে প্রবেশ করতো। কিন্তু কারাবন্দী খুশী ও পুলকভাব দেখে ওরা আশ্চর্য হয়ে যেতো; তারা তাঁদের জিজ্ঞাসা করতো ওগো

তোমরা দুঃখিত নও কেনো! তোমরা তো মৃত্যুর দুয়ারে এবং ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে রয়েছো।

তখন তারা তাদেরকে এই বলে জওয়াব দিতেন- "এ মৃত্যু তো শাহাদাতের যার উপরে কোন নেয়ামত ও সৌভাগ্য নেই।"

তারা ইংরেজ শাসকদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের সচক্ষে দেখা ও কানে শোনার ঘটনাগুলো বর্ণনা করতো। ফলে তাদের রাগ আরো বেড়ে যেতো। কিন্তু কি করবে তারা? এখন যদি তারা তাদেরকে মুক্তি দেয় তাহলে সেই শত্রুদেরকেই মুক্তি দেওয়া হল যারা রাষ্ট্রের বিদ্রোহী ছিল; এরা তো আবার সেই দিকেই ফিরে যাবে। আর যদি তাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয় তা হলে তো তারা নিজেরাই তাদেরকে আশা আকাঙ্ক্ষার মনজিলে পৌঁছিয়ে দেবে; এবং তারা তাদের আনন্দ দানের জন্য চেষ্টা করে যাবে। এসব কিছু বৃটিশদের কাছে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল। এতে তাদের অন্তর স্বস্তি বোধ করতে পারছিল না। সুতরাং তারা এই মুকাদ্দমা নিয়ে চিন্তার পর চিন্তা করা শুরু করল। এবং তারা হত্যা ও মুক্তির মাঝখানে একটা মধ্যপথ পেয়ে গেলো। আসলে ইংরেজ জাতি ছিল যথেষ্ট আইন বিশেষজ্ঞ এবং চতুর।

কোন একদিন শহরের ইংরেজ শাসক কারাগারে আসলো এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত তিনজন আসামীর রায়কে এভাবে পুনর্বিবেচনা করার ঘোষণা দিল। "হে বিদ্রোহী আসামীরা। তোমরা ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে একে আল্লার রাহে শাহাদাত রূপে গণ্য করছ। কিন্তু আমরা চাইনা তোমাদের সেই আশার মনযিলে তোমাদেরকে আমরাই পৌঁছে দেই এবং তোমাদের উপর খুশীর হিল্লোল আমরাই বহিয়ে দেই। এজন্য আমরা তোমাদের মৃত্যুদণ্ড রহিত করে তোমাদেরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড দিয়ে দিলাম।

তাঁরা ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ৮ই ডিসেম্বর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পোর্টবোলিয়ারে পৌঁছে গেলেন। এখানে শায়েখ ইয়াহইয়া দু'বছর ইবাদত-বন্দেগী এবং হকের দাওয়াতে কাটিয়ে দেওয়ার পর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারি ইন্তেকাল করেন। আর শায়েখ জাফর সাদেকপুরীকে ১৮ বছর নির্বাসন দণ্ডে থাকার পর ১৮৮২খ্রিষ্টাব্দে ২২ জানুয়ারী ক্ষমা ও মুক্তির নির্দেশ দেওয়া হয়।

মহান আল্লাহ পাক সত্যই বলেছেন –

"মিনাল্ মুমিনীনা রিজালুন সাদাকু মা আহাদুল্লাহা 'আলাইহি ফামিনহুম মান কাযা নাহাবাহু অ মিনাহুম মাই য়ানতাযিরু অ মা বাদ্দালু তাবদীলা।"

অর্থাৎ মুমিনদের মধ্যে কিছু লোক আল্লাহর সাথে তাদের কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে; তাদের মধ্যে কেউ কেউ শাহাদাত বরণ করেছে; আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে; আর তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন আনে নাই। (সুরা আহযাব, ২৩)

আল্লাহ সুবহানাহু তা'য়ালা আমাদের সকলকে সত্যের পথে, আলোর রাজপথে চলার তাওফীক দান করুক। আমীন!

এক নজরে আলোর রাজপথ

- আল্লাহ যখন রক্ষা করেন
- অন্ধকারে মেহমানদারী
- দুই অনাথ বালকের খুশি
- ফাঁসির মঞ্চে নবীর মহব্বত
- বালকের তরবারীতে আবু জেহেলের রক্ত
- যুদ্ধে যাওয়ার কুস্তি
- দাঁত দিয়ে পেরেক তোলা
- বল্লমের আঘাতে সফলতার উচ্চারণ
- প্রয়াত নবীর নিকট সেনাপতির বার্তা
- কৃচ্ছ্রতায় সঞ্চিত দিরহামগুলোও গেল
- সাদাসিধে পোষাকেও হযরত ওমরের সম্মান
- মানবেতর প্রাণী সেবার অভাবিত পুরস্কার
- এক মহান শাসকের রাজ্য শাসন
- পরিচয় গোপন রাখার মাহাত্ম্য
- মহান যোদ্ধা সালাউদ্দিন আইয়ুবী
- যে উত্তরে হৃদয় গলে
- ক্ষমার মাহাত্ম্য
- বেহেশ্‌তী আনন্দে মৃত্যুদণ্ড বাতিল

আল হিকমাহ্‌ পাবলিকেশন্স

(বিজ্ঞানময় কুরআনিক ইল্‌মের বিশুদ্ধ প্রকাশনা)

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন # ০১৮১৯৪২৩৩২১